# দূর কভু দূর নহে

১২এ, কেদার বসু লেন, ভবানীপুর
কলিকাতা-৭০০০২৫

প্রকাশক : রমা বন্দ্যোপাধ্যায়
শশধর প্রকাশনী
১৯এ, কেদার বসু লেন, ভবানীপুর
কলিকাতা-৭০০ ০২৫

প্রথম প্রকাশ—দোল পূর্ণিমা ১৯৫৯
প্রচ্ছদ ও নামাঙ্কন : গৌতম রায়
প্রচ্ছদ মুদ্রণ : ইম্প্রেশান হাউস
৬৪, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯



মুদ্রণ : অমল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
মৌ প্রেস
১৯এ, কেদার বসু লেন, ভবানীপুর
কলিকাতা-৭০০০২৫

# সূচী

# উৎসর্গ

য়ুরোপ প্রবাসী অনুজপ্রতিম বন্ধু
গৌরাঙ্গ বসুরায়-কে

শঙ্কুদা

বাবুবাগান,
কলিকাতা-৩১

## লেখকের অন্যান্য কয়েকখানি বই

বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা
মধু-বৃন্দাবনে ( তিন পর্ব
গঙ্গাসাগর
লাদাখের পথে
মানালীর মালঞ্চে
জয়ন্তী জুরিখ
রূপতীর্থ খাজুরাহো
পঞ্চবটী
হিমালয় ( অম্‌নিবাস, ২ খণ্ড )
তমসার তীরে তীরে
পঞ্চপ্রয়াগ
চিত্রকূট
যদি গৌর না হ'ত
ব্রহ্মলোকে
সুন্দরের অভিসারে
মায়াময় মেঘালয় ( ২ খণ্ড )
দ্বারকা ও প্রভাসে

# র কভু দূর নহে

আমার প্রপিতামহের পিতৃদেব গঙ্গাধর ঘোষ দস্তিদার বিবাহের পর বেশ কয়েক বছর নিঃসন্তান ছিলেন। বহু পূজা পার্বণ কোবরেজ তাবিজ করেও তাঁর স্ত্রীর কোন সন্তান না হওয়ায় তিনি যখন একেবারে ভেঙ্গে পড়ছেন, তখন তাঁর এক জ্ঞাতিভাই তাঁকে কাশী যাবার পরামর্শ দিলেন। বললেন — কাশীতে গিয়ে বাবা বিশ্বনাথের কাছে সন্তান কামনা করলে, তিনি অবশ্যই সে কামনা পূর্ণ করবেন।

কাজটা কিন্তু সহজ ছিল না। কারণ ঘটনাটি দেড়শ' বছর আগের কথা। তখনকার দিনে বরিশাল জেলার গাভা গ্রাম থেকে কাশী যাওয়া যেমন ব্যয়সাধ্য তেমনি কষ্টকর ও বিপজ্জনক। তবু গঙ্গাধর পরামর্শটা মেনে নিলেন। খাবার-দাবার ওষুধ-পথ্য টাকা-পয়সা ও লোকজন নিয়ে দিন-ক্ষণ দেখে তিনি গাভার খালে নৌকা ভাসালেন।

কালিজিরা কীর্তনখোলা পদ্মা ও গঙ্গা হয়ে বেশ কিছুদিন বাদে সে নৌকা কাশীর ঘাটে নোঙর করল। গঙ্গাস্নান করে গঙ্গাধর সস্ত্রীক বিশ্বনাথ মন্দিরে গেলেন। পুজো দিলেন, মানত করলেন। বাবা বিশ্বনাথকে বললেন—আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ না

করলে আমরা আর ঘরে ফিরব না, তোমার চরণে দেহত্যাগ করব।

তাঁরা কাশীবাস করতে থাকলেন। প্রতিদিন সকালে গঙ্গাস্নানের পর জল গ্রহণ না করে মন্দিরে যেতেন আর বাবা, বিশ্বনাথের কাছে একই প্রার্থনা পেশ করতেন।

তাঁদের কিন্তু খুব বেশীদিন কাশীবাস করতে হল না। কিছুদিন বাদেই কাশীশ্বর গঙ্গাধরের প্রার্থনা পূর্ণ করলেন। আমার পিতামহের পিতামহী সন্তান সম্ভবা হলেন।

পুলকিত অন্তরে ও সকৃতজ্ঞ চিত্তে গঙ্গাধর কাশী থেকে দেশে ফিরে এলেন। যথাসময়ে তাঁদের একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলেন, তিনিই আমার পিতামহেব পিতৃদেব, গঙ্গাধরের একমাত্র পুত্র। বিশ্বনাথের বরপুত্র বলে গঙ্গাধর তাঁর নাম রাখলেন বিশ্বেশ্বর।

আমি সেই বিশ্বেশ্বর ঘোষ দস্তিদারের বংশধর। সেদিন কাশীশ্বর গঙ্গাধরের মনোস্কামনা পূর্ণ করেছিলেন বলেই আমি এই সুন্দর ভুবনে চোখ মেলতে পেরেছি।

আর তাই কাশীশ্বর আমার প্রতি এমন করুণাময়। তাঁর কৃপা না হলে য়ুরোপ ভ্রমণ হত না আমার। ঘটনাটা তাহলে গোড়া থেকেই খুলে বলছি।

ভারত সেবাশ্রম সংঘের পূজনীয় শ্রীদিলীপ মহারাজের আমন্ত্রণে দুর্গাপূজা দেখতে কাশী গিয়েছিলাম। ভারত সেবাশ্রম সংঘ সমারোহের সঙ্গে প্রতিবছর কাশীতে দুর্গাপূজা করেন।

দিনগুলি বড়ই আনন্দে কাটল। সারাদিন কাটত ভারত সেবাশ্রম সংঘের পূজা মণ্ডপে আর কাশীর পথে পথে কিংবা গঙ্গার ঘাটে ঘাটে। অবশেষে কলকাতায় ফিরে আসার দিনটি সমাগত হ'ল। সেদিন সকালেও প্রতিদিনের মতো শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্বৈতমঠের

অধ্যক্ষ পূজনীয় স্বামী অচ্যুতানন্দজীর সঙ্গে প্রাত্যহিক পরিক্রমা করে ফিরে এলাম অতিথি নিবাসে।

তারপরেই মনটা সহসা ভাবী হয়ে উঠল। দোতলায় নিজের ঘরে এসে চুপচাপ শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে ভাবতে থাকলাম কাশীর কথা, আমাদের পরিবারের প্রতি কাশীশ্বরের করুণার কথা। আবার কবে বিশ্বনাথ দর্শনের সুযোগ পাবো জানি না। তাই মনে মনে করুণাময় কাশীনাথকে বলি- ঠাকুর তুমি তো না চাইতেই আমাকে দুহাত ভরে দান করে চলেছো। তোমার আশীর্বাদে আমি অসংখ্য মানুষের অকুণ্ঠ ভালোবাসা লাভ করেছি, হিমালয়ের গহন-গিরি কন্দরে আর সমতল ভারতের পথে প্রান্তরে প্রচুর পরিক্রমা করতে পেরেছি। আমার আর কোন কামনা থাকা উচিত নয়। তবু তোমাকে বলি য়ুরোপ দর্শনের বাসনা আমার বহুদিনের। আমি একবার য়ুরোপ ভ্রমণ করতে চাই।

তখন বোধ করি বেলা বারোটা। বিকেলে ট্রেন। পূজোর ছুটির পর আগামীকাল কলকাতার অধিকাংশ অফিস খুলবে। গাড়িতে খুবই ভিড় হবে। তাহলেও আমার দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। আমি কলকাতা থেকেই বার্থ রিজার্ভ করে এসেছি। তাই শুয়ে শুয়ে বারবার বাবা বিশ্বনাথের কাছে মনে মনে একই প্রার্থনা জানিয়ে যাচ্ছিলাম।

--ভেতরে আসতে পারি। সহসা বারান্দা থেকে কোমল নারীকণ্ঠ ভেসে আসে।

আমার প্রার্থনায় ছেদ পড়ে। তাড়াতাড়ি উঠে বসি। বলি — আসুন, দরজা খোলাই আছে।

দরজা ঠেলে দুটি যুবতী ঘরে ঢোকে। একটি বাঙালী অপরটি শ্বেতাঙ্গিনী। বাঙালী মেয়েটি ছোট-খাটো শ্যামবর্ণা

আর শ্বেতাঙ্গিনী বেশ লম্বা ও স্বাস্থ্যবতী। কিন্তু মোটা নয়। তাব মাথায় ঝাকরা চুল, মুখখানি মিষ্টি। পোষাক সাধারণ এবং ভদ্র, বয়স বোধকরি বছর পঁয়ত্রিশ।

বাঙালী মেয়েটি বলে—আমার নাম মিতা রায়চৌধুরী। আমরা রামকৃষ্ণ মিশনের সেক্রেটারী পূজনীয় সত্যেন মহারাজের কাছ থেকে আসছি। তিনি আপনাকে একখানি চিঠি দিয়েছেন।

চিঠিখানি হাতে নিয়ে ওদের ভেতর এসে বসতে বলি। তারপরে চিঠিটা পড়তে শুরু করি— '......... এই ফরাসী মেয়েটি শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজি মহারাজের দেশ দেখতে এসেছে। এর গুরুদেব গ্রেত্‌জ (প্যারিস) রামকৃষ্ণ মিশনেব শিষ্য। কাশী দর্শনেব পরে এখন সে কলকাতায় যেতে চাইছে। বেলুড় দক্ষিণেশ্বব জয়রামবাটি ও কামারপুকুর প্রভৃতি দর্শন করবে। শুনলাম আপনি আজ কলকাতায় ফিরছেন। আপনি যদি একে সঙ্গে করে নিয়ে যান, বড়ই ভাল হয়। .. .....'

তা তো বুঝলাম। কিন্তু পুজোব ছুটির পরে আগামীকাল কলকাতার সব অফিস খুলবে। ট্রেনে খুবই ভিড় হবে। রিজার্ভেশান ছাড়া আজ কারও কলকাতার গাড়িতে ওঠা যে প্রায় অসম্ভব।

তবুও আপত্তি করতে পারি না। বিদেশিনী, স্বামী বিবেকানন্দের দেশ দেখতে এসেছে।

আমার সম্মতি পেয়ে সে খুশি হয়। সানন্দে নিজের পরিচয় দেয়—আমার নাম গ্যাব্রিয়েল রিফ্‌স্থাল। আমি স্ত্রাসবুর্গে থাকি। আমি শুধু তোমার সঙ্গে যাবো। তোমার কোন অসুবিধে করব না।

ফরাসী হলেও সে বেশ পরিস্কার ইংরেজী বলতে পারে।

মন্দের ভালো। বিনা রিজার্ভেশানে ভিড়ের ট্রেনে যেতে হবে। তার ওপরে যদি আবার আমাদের মধ্যে ভাষা-বিভ্রাট থাকত, তাহলে বিপদ বাড়ত।

আমার আশঙ্কা কিন্তু সত্য হল না। গাড়িতে উঠে বিস্ময়কর ভাবে গ্যাব্রিয়েল একটা বার্থ পেয়ে গেল। সে আমাদের সঙ্গে খেয়ে-দেয়ে শুয়ে-বসে কলকাতায় এলো।

কলকাতায় ফিরে আমি ওকে একটা হোটেল ঠিক করে দিলাম। আমার এবং আমার বন্ধুদের সঙ্গে সে বেলুড় দক্ষিণেশ্বর জয়রামবাটি কামারপুকুর এবং কলকাতার যাবতীয় দ্রষ্টব্যস্থল দর্শন করল। লক্ষ্মীপুজোর দিন ওকে আমার বাড়ি নিয়ে এলাম। পুজো দেখে আর প্রসাদ পেয়ে সে ভারি খুশি হল। কয়েকদিনের মধ্যেই আমরা ভাই-বোন হয়ে গেলাম।

অবশেষে বিদায় দেবার দিনটি সমাগত হ'ল। ওকে হাওড়ায় রাজধানী এক্সপ্রেসে তুলে দিলাম। দিল্লী থেকে ওর ফ্ল্যাইট। গাড়ি ছাড়ার আগে আমার একখানি হাত ধরে গ্যাব্রিয়েল বলল -- আমার ফ্ল্যাটের দরজা তোমার জন্য চিরদিন খোলা থাকবে। তুমি তো বেড়াতে ভালবাসো, একবার য়ুরোপ চলে এসো।

একটু হেসে প্রশ্ন করেছি -- আমি গরীব দেশের একজন নগন্য লেখক, আমি কেমন করে য়ুরোপে যাবো?

সে উত্তর দিয়েছে — দেখো, কাশীতে আমাদের প্রথম দেখা হয়েছে। শুনেছি বিশ্বনাথ বড়ই জাগ্রত এবং দয়ালু। তাঁর দয়ায় আবার দেখা হবে আমাদের।

সহাস্যে বলেছি — হবে বৈকি? নিশ্চয়ই দেখা হবে আমাদের। তুমি আবার ভারতে আসবে।

— না। এবারে তুমি যাবে আমার কাছে।

কি বলব ? ওরা উন্নত ও ধনী দেশের নাগরিক। ওদের পক্ষে এ দেশে আসা কিছু একটা কষ্টকর নয়, কিন্তু আমাদের পক্ষে য়ুরোপ ভ্রমণের আশা যে আকাশ-কুসুম, তা ওকে বোঝানো মুশকিল। সুতরাং সে চেষ্টা না করে শুধু বলেছি — য়ুরোপে যেতে পারলে, আমি নিশ্চয়ই তোমার কাছে আসব।

গ্যাব্রিয়েল কিন্তু ঠিকই বলেছিল, বাবা বিশ্বনাথের কৃপায় সেই আকাশ-কুসুম সত্য হল। কাশী থেকে ফিরে আসার মাত্র আট মাসের মধ্যে আমি সত্য-সত্যই য়ুরোপের মাটিতে পদার্পণ করলাম। কিন্তু তাড়াতাড়িতে সে কথা আগে জানাতে পারি নি তাকে। জুরিখ থেকে চিঠি লিখে আমি তাকে লণ্ডনের ঠিকানায় ফোন করতে বললাম। গ্যাব্রিয়েল ফ্রান্সের পূর্ব-প্রান্তিক শহর স্ত্রাসবুর্গে থাকে।

লণ্ডনে ওর ফোন পেলাম। সে প্রথমেই বলে উঠল — কি বড়'যে বলেছিলে, তুমি আমার কাছে আসতে পারবে না ? তাব কণ্ঠে খুশির উচ্ছলতা। তারপব সে আমাকে পরামর্শ দেয় — হিথ্রো থেকে স্ত্রাসবুর্গের সোজা ফ্লাইট আছে। তুমি আগে এখানে এসো, তারপরে পারী (প্যারিস) দেখবে।

— কিন্তু আমাব বিমান টিকেটে যে স্ত্রাসবুর্গে 'স্টপ্ওভার' নেই, আমাকে প্যারিস নামতেই হবে।

— তুমি আরেকখানি টিকেট করে হিথরো থেকে সোজা স্ত্রাসবুর্গ চলে এসো, আমি তোমার ভাড়া দিয়ে দেব।

— কি দরকার ? আমি বলেছি — তার চাইতে আমি প্যারিস আসছি। সেখানে থেকে সুবিধে মতো ট্রেনে করে স্ত্রাসবুর্গ ঘুরে আসব।

— না। সে বলে উঠেছে — তুমি যেদিন ফ্রান্সের মাটিতে পা দেবে, সেদিনই তোমার সঙ্গে আমার দেখা হওয়া চাই।

তুমি আমার দেশে আসছ কাজেই আমি হব তোমার প্রথম 'হোষ্ট', বেশ তুমি কবে কোন্ ফ্লাইটে পারী আসছ ব'লো আমি বিমানবন্দরে তোমাকে 'রিসিভ' করব।

—কিন্তু স্ত্রাসবুর্গ যে প্যারিস থেকে বহুদূর!

—হ্যাঁ ৫০০ কিলোমিটার। কিন্তু কি করব বলো, তুমি যখন পারীতেই আসবে, তখন আমাকেই পারী যেতে হবে।

তাই এসেছিল সে। অফিসের ছুটি নিয়ে ছুটে এসেছিল প্যারিসের শার্ল-দ্য-গল্ (Charles De Gaulle বিমানবন্দরে। স্ত্রাসবুর্গ থেকে প্যারিস আসতে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা। সেখান থেকে বিমানবন্দর আরও একঘণ্টা। আমার বিমান নেমেছে বিকেল সওয়া চারটায় আর সে নাকি পৌছে গিয়েছে বেলা তিনটেয়। তার মানে সে সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছে।

আমরা বিমানবন্দরে থেকে বাসে করে প্যারিস এলাম। ফরাসী বোন গ্যাব্রিয়েলের পাশে বসে আমার সঙ্গে ফরাসী-দেশের প্রথম পরিচয় হল। ওদের গার-দ্য লেস্ট (Gare de L' Est) স্টেশনের কাছেই একটা হোটেলে উঠলাম। মালপত্র রেখে কফি খেয়ে দুজনে বেড়াতে বের হলাম। 'আইফেল টাওয়ার' দেখে 'স্যেন' নদীতে স্টীমার ট্রিপ' করলাম। তারপরে 'নোতরদম্' গীর্জা দেখে একটা চীনা রেস্তোরায় ডিমের ঝোল দিয়ে পোলাও খেয়ে রাত বারোটায় হোটেলে ফিরে এলাম। গ্যাব্রিয়েল মাছ-মাংস খায় না। ডিম য়ুরোপে নিরামিষ খাদ্য রূপে বিবেচিত।

সময়টা জুন মাস অর্থাৎ গ্রীষ্মকাল। প্যারিসে তখন প্রায় দশটায় সন্ধ্যা হয়। অতএব রাত বারোটা মানে সবে সন্ধ্যে।

তাছাড়া গ্রীষ্মকালে প্যারিস শহর রাতে ঘুমায় না। আমরা দুজনে তাই শুয়ে শুয়ে বহুক্ষণ ধরে গল্প করলাম। নানা গল্প। আমার বাড়ি থেকে ওর ঘর। গল্পে গল্পে কলকাতা ও স্ত্রাসবুর্গ এক হয়ে গেল।

পরদিন সকালে উঠে আবার দুজনে বেরিয়ে পড়লাম। পাপ্‌মিডু সেণ্টার দেখে ও লুভ (Louvre) মিউজিয়ামে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ফিরে আসি হোটেলে। খেয়ে নিয়ে স্টেশনে এলাম। গ্যাব্রিয়েল আমাকে হোটেলের বিল দিতে কিম্বা রেলের টিকেট কাটতে দিল না। সব মিলে আমাদের টাকায় ওর হাজারখানেক টাকা খরচ হয়ে গেল।

সেবার আমি মাত্র একদিন স্ত্রাসবুর্গে ছিলাম। আলাপ হয়েছিল ওর বোন হেলেন, মা মিসেস রিফস্থাল, বান্ধবী জানিন এবং বন্ধু সার্জ ও এ্যালার সঙ্গে। স্ত্রাসবুর্গের 'ইল্' নদীতে হেলেনের ছমাসের ছেলে সারদাকে কোলে নিয়ে দুই বোনের সঙ্গে 'লঞ্চ-ট্রিপ' করেছি। দেখেছি ক্যাথড্রেল মিউজিয়াম ও বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯২১ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল।

বিকেলে গিয়েছি ওদের যোগশিক্ষা কেন্দ্রে। আলাপ হয়েছে গুরুজী ও মাতাজীর সঙ্গে। দেখে আনন্দিত হয়েছি যে শুধু গ্যাব্রিয়েল নয়, এরা সবাই ভারতকে ভালোবাসেন। শ্রদ্ধা করেন আমাদের সনাতন ধর্ম ও সংস্কৃতিকে।

পরদিন সকালে সহসা গ্যাব্রিয়েল বলে বসল—তোমার আজ যাওয়া হবে না।

—কেন?

—কেন আবার! এতদূর থেকে কোন ভাই তার বোনের

কাছে এসে মাত্র একদিন থাকে ?

—কিন্তু, তুমি তো জানো বোন, সাতদিন পরে আমার বার্লিনের ফ্লাইট। ফ্রান্সে এসেও যদি প্যারিস শহরটা মোটামুটি দেখে না যাই, তাহলে যে দেশে ফিরে বড্ড খারাপ লাগবে।

সে আর আপত্তি করে নি। স্টেশনে বিদায় বেলায় অশ্রুসিক্ত নয়নে বলেছে — চলে যাচ্ছ, যাও। তবে আমাদের যোগাশ্রমে বক্তৃতা দেবার জন্য তোমাকে আমরা আনব এখানে, তখন কিন্তু অনেক অনেকদিন তোমাকে থাকতে হবে আমার কাছে।

আমি বলেছি কিন্তু এবারে যে তোমার ভারতে যাবার পালা।

— না ! চোখ মুছে গ্যাব্রিয়েল উত্তর দিয়েছে। তার আগে তুমি আবার ফ্রান্সে আসবে, আমাদের যোগাশ্রমে ভারতের কথা বলবে।

শেষ পর্যন্ত ওর ইচ্ছাই পূর্ণ হয়েছে। দু'বছরের মধ্যে আমি আবার য়ুরোপে এসেছি এবং বলা বাহুল্য সে আমার বিমান-টিকেট পাঠিয়ে দিয়েছে।

এবারেও সে প্যারিস গিয়ে আমাকে স্ত্রাসবুর্গে নিয়ে আসতে চেয়েছিল কিন্তু আমি তাকে বারণ করেছি। জানি না আমার চিঠি পেয়ে সে কতখানি উৎকণ্ঠিত হয়েছে। তবে সে আর বিমানবন্দরে আসে নি।

গতকাল বিকেলে প্যারিসে পৌঁছে বন্ধু অসীম রায়ের বাড়িতে রাত কাটিয়েছি। আজ সকালে আরেকবার আইফেল টাওয়ার দেখে গার-দ্য-লেস্ট থেকে স্টেন ধরেছি। গতবারও আমি এই একই ট্রেনে স্ত্রাসবুর্গে গিয়েছিলাম। সেদিন গ্যাব্রিয়েল আমার পাশে ছিল, আজ নেই।

না থাক, আজ যে আমি তার কাছেই চলেছি, আমার ফরাসী বোন গ্যাব্রিয়েল রিফস্থালের কাছে।

আমি একজন মধ্যবিত্ত ভারতীয়। পরিবারে সবার বড়। আমরা চার ভাই ও চার বোন। স্নেহের পাত্রীর অভাব নেই আমার। তবু গ্যাব্রিয়েলের প্রতি কেন আমার এই আকর্ষণ? আজ কয়েক মাস ধরে যে মুহূর্তটির প্রতীক্ষা করছি, সেটি সমাগত প্রায়। আমি পুলকিত, আমি উচ্ছসিত, আমি উত্তেজিত।

অবশেষে স্ত্রাসবুর্গ ষ্টেশনে এসে গাড়ি থামল। স্যুটকেশ ও ব্যাগ হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে পড়ি গাড়ি থেকে। এগিয়ে চলি সামনের দিকে। মনে পড়ছে দু'বছর আগের কথা। সেদিন গ্যাব্রিয়েলের সঙ্গে ঠিক এইভাবে এগিয়ে চলেছিলাম। আজ আমি একা। আজ গ্যাব্রিয়েল সঙ্গে নেই।

না, আছে। ঐ তো সে ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসছে। তার সঙ্গে হেলেন ও সারদা—আমার আড়াই বছরের দুরন্ত ভাগ্নে!

গ্যাব্রিয়েল কাছে আসতেই আমি স্যুটকেশ ও ব্যাগ প্লাটফর্মে রেখে দিই। সে দু'হাত দিয়ে আমার একখানি হাত চেপে ধরে। ওর স্পর্শ থেকে আবেগ আর আনন্দ ঝরে পড়ছে। আমিও আনন্দিত। আমি অভিভূত।

হেলেন এসে আমার আরেকখানি হাত ধরে। তারও আনন্দ যেন উপচে পড়ছে। আর সারদা?

হেলেনের কোলে বসে সে একটুকাল অপলক নয়নে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে, কালো মানুষটির দিকে। তারপরে সহসা সে তার ছোট হাতদুটি জড়ো করে কপালে ঠেকিয়ে কোমলকণ্ঠে বলে ওঠে — ছক্কু, মেসি বোকু।

তাড়াতাড়ি দু'বোনের হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ভাগ্নেকে কোলে তুলে নিয়ে বলি — মেসি বোকু!

আশ্চর্য! সারদা আমার বুকে মুখ লুকোল! গতবার আমি যখন স্ত্রাসবুর্গে এসেছি, তখন ওব বয়স মাত্র ছ'মাস। গ্যাব্রিয়েল মা-সারদাময়ীর নামে ওর নাম রেখেছে। ওরা অবশ্য 'র' উচ্চারণ করতে পারে না বলে ওকে ডাকে 'সাহাদা'।

যাগ গে, যেকথা বলছিলাম। ব্যাপারটা অবাক হবার মতই বটে। আমাকে ওর মনে থাকার কথা নয়। তার ওপরে আমি ওর ভাষা জানি না। তবু আড়াই বছবের শিশুটি মুহূর্তে আমাকে আপন করে নিল।

ওরা দুই বোন আমাব ব্যাগ ও স্যুটকেস হাতে তুলে নেয়। সারদাকে কোলে তুলে আমি চলতে শুরু করি। চলতে চলতে গ্যাব্রিয়েল নানা প্রশ্ন করতে থাকে — আমার ভাঙা পা এখন কেমন আছে? বাড়ির সবার খবর কি? পথে আমার কোন কষ্ট হয়েছে কিনা? গতকাল কখন প্যারিসে পৌঁচেছি? আজ দুপুরে কি খেয়েছি? এখন আমার নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে? ইত্যাদি আরও অনেক প্রশ্ন। কলকাতা হলে আমার সহোদরা আমাকে যেসব প্রশ্ন করতে পারত।

হেলেনের ছোট গাড়ি করে আমরা সেণ্টার অর্থাৎ যোগাশ্রমে এলাম। দেখা হল গুরুজী ও মাতাজীর সঙ্গে, সার্জ এ্যাঁলা ও জানিনের সঙ্গে। দেখা হল গ্যাব্রিয়েলের মায়ের সঙ্গে। এদের মধ্যে কেবল গ্যাব্রিয়েল ভাল ইংরেজী বলতে পারে আর সার্জ এ্যাঁলা ও হেলেন কাজ চালাতে পারে। অন্যরা ফরাসীতেই কথা বলছেন। আমি ফরাসী জানি না। অথচ এঁরা সবাই যে আমাকে পেয়ে খুশি হয়েছেন, তা বেশ বুঝতে পারছি।

যোগাশ্রমে গ্যাব্রিয়েলের ফ্ল্যাটে আমার থাকার ব্যবস্থা

হয়েছে। আর সে ব্যবস্থা প্রায় রাজসিক। কার্পেটে মোড়া সুবিশাল ঘর। ফোমের ম্যাট্রেস দেওয়া বিছানা ও লেখার চেয়ার টেবল্। টেবিলে সিদ্ধিদাতা গণেশের একটি ছোটমূর্তি দেওয়ালে শ্রীশ্রীঠাকুব শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজির ফটো। খাওয়া নিরামিষ। মাঝে মাঝেই বাঁশমতী চালের ভাত ও সোনা-মুগের ডাল খেয়েছি। পানীয় বলতে চা-কফি আর ফলের রস। যোগাশ্রমে মদের প্রবেশ নিষেধ আর গ্যাব্রিয়েল দার্জিলিঙের চা ছাড়া অন্য কোন চা খায় না।

এবারে একটানা প্রায় তিন সপ্তাহ গ্যাব্রিয়েলের কাছে ছিলাম। আমি আসব বলে সে একমাস অফিস ছুটি নিয়েছে! সুতরাং সর্বদাই সে আমার সঙ্গে আছে। সভার চার দিন বাদ দিয়ে প্রায় প্রতিদিন আমরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পথে-পথে ঘুরে বেড়িয়েছি। তাব মধ্যে গ্যাব্রিয়েলের মায়েব গাড়িতে করে হেলেন ও সারদা সহ তিনদিন এ্যাল্সাস্ অঞ্চলে ভ্রমণ করেছি।

প্যারিসের প্রায় সমান্তরাল রেখায় ফ্রান্সেব পূর্বাঞ্চলে জার্মান সীমান্তে রাইন নদীব তীরে সুপ্রাচীন নগবী স্ত্রাসবুর্গ। ফ্রান্সের এই অঞ্চলকে বলে এ্যাল্সাস্ (Alsaee), ও'রা উচ্চারণ করেন এ্যাল্জাস্। এই অঞ্চলের উত্তর ও পূর্বে পশ্চিমজার্মানী দক্ষিণে সুইজারল্যাণ্ড। মধ্যযুগে এটি ফ্রান্সের পূর্ব-তোরণ রূপে পরিচিত ছিল। তার ওপরে এ অঞ্চলটির প্রাকৃতির দৃশ্য যেমন মনোরম, তেমনি এটি কৃষিসম্পদে সমৃদ্ধ। ছোট পাহাড় আর উর্বর উপত্যকা নিয়ে এ্যাল্সাস্ আঙ্গুর চাষের আদর্শক্ষেত্র। প্রায় একশ' বর্গকিলোমিটার জুড়ে' এখানে আঙ্গুরক্ষেতের বিস্তার। সুতরাং মদশিল্পের জন্য এ অঞ্চলের খ্যাতি সুপ্রাচীন। তাই মধ্যযুগে আঙ্গুরক্ষেত

দখলের জন্য প্রচুর যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছে এ অঞ্চল। প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে প্রায় প্রতি পাহাড়ের শিখরে তৈরি হয়েছিল দুর্গ। সেসব দুর্গের প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে বহুকাল। কিন্তু আমাদের রাজস্থান ও মহারাষ্ট্রের দুর্গগুলির মতো ফরাসীরা সেগুলিকে ধ্বংস হয়ে যেতে দেন নি। বরং সুপ্রশস্ত মোটর পথ তৈরি সহ সেগুলির প্রভূত উন্নতি সাধন করেছেন। এখন সেই পরিত্যাক্ত দুর্গগুলি জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্রে রূপান্তরিত।

গ্যাব্রিয়েলের মা তাঁর গাড়িতে করে আমাদের তিনদিন এ্যালসাসের পাহাড় জঙ্গল গীর্জা ও দুর্গে দুর্গে নিয়ে গিয়েছেন। দেখা হয়েছে হাজার হাজার বিদেশী বিশেষ করে জার্মান পর্যটকের সঙ্গে। পরিত্যক্ত দুর্গগুলোর মাধ্যমে ফরাসী সরকার লক্ষ লক্ষ ফ্রাঙ্কের বিদেশী মুদ্রা অর্জন করেছেন।

এখানে একটি কথা বলে নেওয়া দরকার। য়ুরোপের অকমিউনিস্ট দেশের বাসিন্দাদের অন্য কোন অকমিউনিস্ট দেশে যাওয়া ও থাকায় কোন বিধিনিষেধ নেই। ফলে ওঁরা একদেশে বাস করে আরেক দেশে চাকরি পর্যন্ত করতে পারছেন। প্রতি-দিন যাতায়াত করছেন। বেড়াতে আসা তো সামান্য ব্যাপার।

সভা আলোচনা গল্প ও ভ্রমণের মধ্যদিয়ে বিশটা দিন ফুরিয়ে গেল। এলো বিদায় নেবার পালা। আগের রাতটা কিছুতেই ঘুমোতে পারলাম না। সবার কথাই মনে হয়েছে। কিন্তু সবার সব কথা ছাপিয়ে গ্যাব্রিয়েলের জন্যই মনটা বেশি ভারী হয়ে উঠেছে। বার বার ভাবতে চেয়েছি, ওর সঙ্গে আমার কোন রক্তের সম্পর্ক নেই, সে যে বিদেশিনী। নেহাৎই পথের পরিচয়।

পারি নি। মন প্রতিবাদ করেছে- রক্তের সম্পর্কই আত্মীয়-

তার একমাত্র মাপকাঠি নয়। স্নেহ মায়া শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় সীমান্ত কোন সীমারেখা নয়। তাছাড়া যাঁর কৃপায়, তুমি এই পৃথিবীতে এসেছো। গ্যাব্রিয়েল যে তোমার জীবনে সেই কাশীশ্বর বাবা-বিশ্বনাথের অবদান।

কিন্তু আমার যে আর সেখানে থাকার উপায় নেই। পঞ্চাশ দিনের ছুটি নিয়ে য়ুরোপে ভ্রমণে এসেছি, তার মধ্যে বিশদিনই স্ট্রাসবুর্গে কাটলাম। বাকি এক মাসের মধ্যে যেতে হবে ছ'টি দেশে, বিমানে নয় ট্রেন ও গাড়িতে করে। আগামী কাল এখান থেকে ট্রেনে করে বন্ যাবো। সেখান থেকে গাড়ি করে বেলজিয়াম ও লুক্সেমবার্গ দেখব, তারপর ব্ল্যাক-ফরেষ্ট দেখে মিউনিক হয়ে অস্ট্রিয়া-জার্মান, সীমান্তের আলপস পর্বতে পদচারণা করে পূর্ব-জার্মানীর ভেতর দিয়ে বার্লিন পৌঁছব। সেখান থেকে ট্রেনে করে সুইডেন ডেনমার্ক ও হল্যাণ্ড হয়ে আবার প্যারিস ফিরে আসতে হবে।

প্যারিস থেকে আমার বিমান। সুতরাং আর এখানে থাকার উপায় নেই। কিন্তু মন সেকথা মানতে চাইছে না।

রাতে খাবার সময় কথাটা বলেছি গ্যাব্রিয়েলকে। কিন্তু কাকে বলা? তারও যে একই অবস্থা। সে বলেছে- কতদিন ধরে এই দিনক'টির কথা ভেবেছি। ছ'মাস আগে ছুটি নিয়েছি। ঠিক করেছি, এবার 'সামার'-এ আর কোথাও যাবো না, তুমি আমার কাছে থাকবে। তোমার থাকা, তোমার খাওয়া, তোমার বেড়ানো নিয়ে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, কত কথা ভেবেছি। যা ভেবেছি, তা সত্য হয়েছে। তবু আজ মনে হচ্ছে, দিনগুলো বড্ড তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেল। তুমি কাল চলে যাচ্ছ এখান থেকে।

না, আমরা দু'জনে চোখের জল ফেলি নি। তবে বুকের

মধ্যে কান্নার উপস্থিতি উপলব্ধি করেছি। সকালে সে আমাকে ডেকে দিয়েছে। আমি গোছ-গাছ করে তৈরি হয়ে নিয়েছি আর সে আমার ব্রেকফাষ্ট্ তৈরি করেছে।

একটু বাদে গুরুজী, মাতাজী ও সার্জ এসেছেন। তাঁরা আমাকে ফটো ঘড়ি ও আমার বক্তৃতার ক্যাসেট উপহার দিলেন। মাতাজী ঘড়িটি দেখিয়ে বললেন -- এটাতে ব্যাটারী লাগে। একটা ব্যাটারীতে এক বছর চলে। ব্যাটারী লাগিয়ে আরেকটা ব্যাটারী দিয়ে দিলাম। এতে ঘড়িটা দু'বছর চলবে। তার আগে তুমি আবার এখানে আসবে, তখন ব্যাটারী নিয়ে যাবে।

তার মানে দু'বছরের মধ্যে ওঁরা আবার আমাকে এদেশে আনবেন। কিন্তু কেন? আমার মতো একজন নগণ্য লেখকের জন্য কেন এঁরা বার বার এত খরচ করবেন। এই খরচে তো এঁরা একজন সুপণ্ডিত ভারতবিশারদকে নিয়ে আসতে পারেন। কিন্তু কে এই প্রশ্নের জবাব দেবে? অতএব চুপ করে থাকি।

অবশেষে বিদায় নিই যোগাশ্রম থেকে, আমার বিশদিনের আনন্দ-নিকেতন থেকে। সার্জ মাতাজী ও গুরুজীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাব্রিয়েলের সঙ্গে ষ্টেশনে আসি। আমি চলে যাচ্ছি স্ত্রাসবুর্গ থেকে, চলে যাচ্ছি আমার ফরাসী বোনকে ছেড়ে।

একটু বাদে সারদাকে নিয়ে হেলেন আসে, আসে জানিন গতকাল সে আশ্রমে এসে দেখা করতে পারে নি বলে আজ অফিসে একঘণ্টা ছুটি নিয়ে ষ্টেশনে এসেছে। জানিন ইংরেজী জানে না, তার সঙ্গে আমি কথা বলতে পারি না। তবু সে আমার সঙ্গে দেখা করতে ছুটে এসেছে।

আমার ভাষা বুঝতে পারে না সারদা। তবু সে বোধকরি বুঝতে পেরেছে, আমি আজ ওকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি। তাই সে আর

আমার কোল থেকে নামতে চাইছে না।

অবশেষে ট্রেন আসে। এই ট্রেনটির দুটি অংশ একটি 'ফ্রাঙ্কফুর্ট' থেকে 'মিউনিক্' চলে যাবে। আরেকটি 'কোব্লেঞ্জ' হয়ে 'বন্' এবং 'কোলন্'। আমি বন্ যাবো। সুতরাং ওরা দেখে শুনে আমাকে ঠিক বগি বলে দেয়। নিজেরাই আমার ব্যাগ ও স্যুটকেশ নিয়ে আসে। সিটের ওপরে মালপত্র রেখে ওদের সঙ্গে আমিও নেমে আসি প্ল্যাটফর্মে। গ্যাব্রিয়েল বলে—এখানে আমরা রয়েছি, গাড়ি থেকে নামছ ঠিক আছে। কিন্তু পথে কোন ষ্টেশনে আবার নামা-ওঠা ক'রো না যেন।

আমি মাথা নাড়ি। কি করব? ভালোবাসা আর উৎকণ্ঠার যে কোন জাতি নেই, ধর্ম নেই, দেশ নেই।

আর কেবল ওর কথাই বা বলি, কেন? হেলেন এবং জানিন আমাকে নানা পরামর্শ দেয়। এমন কি সারদা পর্যন্ত আমার কোলে বসে সমানে বকর বকর করে চলেছে। আমি ওর ভাষা বুঝি না। তবে অনুমান করি সেও আমাকে কোন পরামর্শ দিচ্ছে।

অবশেষে অন্তিম সময় সমাগত হল। সহসা গ্যাব্রিয়েল প্রায় চিৎকার করে উঠল —গাড়ি ছাড়ার সময় হল, এখুনি দরজা বন্ধ হয়ে যাবে।

তাড়াতাড়ি সারদাকে হেলেনের কাছে দিয়ে উঠে আসি গাড়িতে। সারদা কেঁদে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে কান্না সংক্রামিত হয় —গ্যাব্রিয়েল হেলেন এবং জানিনের চোখগুলি অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল।

সারদাকে শান্ত না করেই হেলেন আরেকখানি হাত দিয়ে আমার হাত ধরে বলে—আবার দেখা হবে।

—নিশ্চয়। মাথা নেড়ে বলি।

জানিন আমার সঙ্গে করমর্দন করে। কি যেন একটা বলে। আমি ওর ভাষা জানি না। তবু বুঝতে পারছি, আমার এই বোনটিও একই আশ্বাস দিচ্ছে আমাকে।

সারদার কান্না বেড়েই চলেছে, সে আমার কোলে আসতে চাইছে। হেলেন চোখ মুছতে মুছতে দূরে সরে যায়।

এগিয়ে আসে গ্যাব্রিয়েল — আমার বারাণসীর বোন গ্যাব্রিয়েল রিফস্থাল। সে তার দুহাত দিয়ে আমার হাত দুখানি ধরে শান্তস্বরে বলে — সাবধানে চলা ফেরা ক'রো, সর্বদা খেয়াল রেখো, এখানে পথের ডানদিকে দিয়ে গাড়ি চলে। ভাঙা পায়ের কথা কখনো ভুলে যেও না। আজকাল য়ুরোপের প্রায় সব বড় শহরেই পকেটমার ও ছিনতাই হচ্ছে। বন্‌ পৌঁছেই আমাকে একটা ফোন ক'রো।

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাই। তারপর জিজ্ঞেস করি - আবার কবে দেখা হবে আমাদের ?

— আগামী গ্রীষ্মে। এবার আমি যাবো তোমার কাছে। আগামী বছর আমি ইণ্ডিয়াতে আসবই আসব। তুমি কেঁদো না।

বলতে বলতে সে নিজেই কেঁদে ফেলে। আমিও চোখের জল লুকোতে পারি না।

চোখ মুছে তাকে সান্ত্বনা দিতে চাই। সময় পাই না। গার্ডের বাঁশি বেজে ওঠে। সে তাড়াতাড়ি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আমাকে ভেতরে ঠেলে দেয়। প্রচণ্ড শব্দ করে গাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে যায়। দরজার ছোট একফালি কাচের ভেতর দিয়ে একবার দেখতে পাই ওকে। তারপরেই গাড়ি চলতে শুরু করে, সে হারিয়ে যায়।

সেদিন বারাণসী ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম থেকে যাকে গাড়িতে

তুলে নিয়েছিলাম, তাকে আজ স্ত্রাসবুর্গ ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে রেখে আমাকে বিদায় নিতে হল। আমার ইষ্টদেবতা কাশী-শ্বরের অবদান কি হারিয়ে গেল?

না। কাশী বিশ্বনাথের কৃপায় আমি আমার ফরাসী-বোনকে আবার খুঁজে পাবো। কারণ ভাই-বোনের ভালো-বাসায় কোন দূরত্বই দূরান্তর নয়—'দূর কভু দূর নহে'। ভালো-বাসার ভাষায় দেশ বলে কোন শব্দ নেই। আর আমার জীবনে বিশ্বনাথ পরম-করুণাময়।

## 'মোদের গরব, মোদের আশা '

গতবার যুরোপ ভ্রমণের সময় আমি স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার কোন দেশে যেতে পারিনি। তাই এবারে যুরোপ ভ্রমণের সুযোগ পেয়ে প্রথমেই মনে পড়েছিল সুইডেন ও ডেনমার্কের কথা। কিন্তু এবারে আমার বিমান-টিকেট কেবল প্যারিস্ পর্যন্ত। সেখান থেকে আমাকে যেতে হবে স্ত্রাসবুর্গ। তারপরে বন এবং বার্লিন যাবার কথা। বার্লিন থেকে সুইডেন বহুদূর। তারপরে আবার দেশে ফিরে আসার জন্য প্যারিসে ফিরে আসতে হবে। থাকা-খাওয়া জুটে যাবে কিন্তু রেল-ভাড়া? য়ুরোপে রেলভাড়া বড্ড বেশি। অথচ আমার সম্বল তো সেই পাঁচ শ' ডলার। ভারতের হিসেবে যুরোপের বাজারে যার দাম বড়জোর হাজারখানেক টাকা।

তবু সুইডেন ভ্রমণের লোভ সামলাতে না পেরে প্রবোধদার (৺সুসাহিত্যিক প্রবোধকুমার সান্যাল) বাড়িতে হাজির হলাম। বৌদির কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে চিঠি লিখলাম জনৈক গজেন্দ্র কুমার ঘোষকে। উত্তর এলো কয়েকদিন বাদেই। অপরিচয়ের ব্যবধান মুছে গজেনবাবু লিখলেন, 'খুবই খুশি হ'য়েছি আপনার সুইডেন আসার অভিপ্রায় আছে শুনে। আপনাকে এই পত্রে স্বাগতম জানাচ্ছি। সুইডেন ছাড়া পাশাপাশি দেশগুলিতে যদি

যেতে ইচ্ছে করেন, থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া যেতে পারে।...'

চিঠি পেয়ে আমিও খুশি হলাম। তবে তার চেয়েও জেনে বেশী আনন্দিত হলাম যে সুইডেন প্রবাসী বাঙালীদের সহায়তায় গজেনবাবু পাঁচ বছর যাবৎ গোথেনবার্গ ( Goteborg ) থেকে 'উত্তর-প্রবাসী' নামে একটি বাংলা সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশ করে চলেছেন।

এবারে স্ত্রাসবুর্গের একটি সংস্থা আমাকে নেমন্তন্ন করেছিলেন। সুতরাং সভা ও ভ্রমণের জন্য আমাকে একনাগাড়ে তিন সপ্তাহ ফ্রান্সে থাকতে হল। তারপরে এলাম পশ্চিম জার্মানীর রাজধানী বন্ শহরে। শ্রীমতী তৃণা পুরোহিত রায় সেখানে 'টেগোর ইনস্টিটিউট' নামে একটি রবীন্দ্রচর্চা ভবন পরিচালনা করছেন। তৃণাদির বাড়িতে পৌঁছে দেখি গজেনবাবুর চিঠি এসে পড়ে রয়েছে। তিনি লিখেছেন, মিহির বিশ্বাস নামে জনৈক যুবক আমার স্টক্‌হোমে থাকা-খাওয়া ও ভ্রমণের ব্যবস্থা করবে। তিনি মিহিরের ফোন নম্বর ও ঠিকানা জানিয়েছেন।

কিন্তু আমি মিহিরকে কিছুই জানাতে পারলাম না। কারণ আমি বন্ থেকে বেলজিয়াম এবং লুক্সেমবার্গ দেখব। তারপর বন্ধু গৌরাঙ্গ বসু রায় ও শঙ্কর রায়ের সঙ্গে গাড়িতে করে ব্ল্যাক-ফরেস্ট ( ব্যাভেরিয়া ) দেখে মিউনিক যাবো। সেখান থেকে জার্মানী ও অস্ট্রিয়া সীমান্তের আল্পস পর্বত দেখে পূর্ব জার্মানীর ভেতর দিয়ে পশ্চিম বার্লিনে পৌঁছব। সেখানেও গৌরাঙ্গর বাড়িতে থাকতে হবে কয়েকদিন। সুতরাং মিহিরকে তখুনি আমার সুইডেন ভ্রমণের সঠিক তারিখ জানানো সম্ভব ছিল না।

যাই হোক বন্ থেকে তিন হাজার কিলোমিটার ঘুরে বার্লিন পৌঁছে শুনলাম গজেনবাবু ফোন করেছিলেন। তিনি

আমাকে সুইডেন যাবার অনুরোধ করেছেন। তখন আমার হাতে মাত্র কয়েকটা দিন সময় ছিল, তবু এই আন্তরিক আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারলাম না।

অতএব একদিন সকালে শঙ্কর ও তার স্ত্রী জয়ার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গৌরাঙ্গ ও তাঁর মেয়ে ডায়নার সঙ্গে রেল স্টেশনে এলাম। তারা আমাকে সুইডেনগামী ট্রেনে তুলে দিল। সকাল সাড়ে দশটায় গাড়ি ছাড়ল।

পূর্ব জার্মানীর ভেতর দিয়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আমরা বিকেল সাড়ে পাঁচটায় বাল্‌টিক সাগরের তীরে সাসনিট্‌জ (Sassnitz) বন্দরে পৌঁছলাম। আমাদের ট্রেনটা এসে জাহাজে উঠল। গাড়িতে মালপত্র রেখে লিফ্‌টে করে জাহাজের ওপরতলায় উঠে এলাম। চারদিক কাচ দিয়ে ঘেরা চমৎকার রেস্তোরাঁ ও ডিউটি ফ্রি শপ। খেয়ে বেড়িয়ে আর বালটিকের অপরূপ রূপ দেখতে দেখতে সাড়ে ন'টার সময় সুইডেনের ট্রেলেবোর্গ (Trelleborg বন্দরে পৌঁছলাম। তখনও সন্ধ্যে হতে দেরি আছে। সুতরাং দিনের আলোতেই সুইডেনের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হল।

জাহাজের ওপর থেকে নেমে আবার গাড়িতে চড়ে বসলাম। না, দীর্ঘ সাড়ে তিন ঘণ্টা অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে থেকেও মালপত্র খোয়া যায় নি।

ট্রেনটা জাহাজ থেকে বের হয়ে আবার রেল পথ ধরে চলতে শুরু করল। সন্ধ্যার একটু পরে অর্থাৎ পৌনে এগারোটার সময় আমরা মালমো জংশনে পৌঁছলাম। সেখানে গাড়ি পালটাতে হল। রাত সাড়ে এগারোটায় গাড়ি ছাড়ল। পরদিন সকাল সাড়ে সাতটায় সুইডেনের রাজধানী ষ্টক্‌হোমে পৌঁছলাম। আমার বহুকালের বাসনা পূর্ণ হল।

মিহিরের স্ত্রী ভারতী বলেছে, সে শাড়ি পরে আসবে। এবং স্টেশনের 'এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কের সামনে অপেক্ষা করবে। আমি এসে সেইখানেই দাঁড়ালাম।

না, শাড়ী পরা কাউকে দেখছি না! কিন্তু আমাকে কোন দুশ্চিন্তায় পড়তে হয় না। একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক এগিয়ে এসে নমস্কার করেন, বিশুদ্ধ বাংলায় পরিচয় দেন—আমার নাম সুজিত দত্ত। মিহিরের কাছে শুনলাম, আপনি আসছেন। ভাবলাম, ওর তো গাড়ি নেই, আপনাকে ওর বাড়িতে পেঁছে দিয়ে যাই। ভারতী এখুনি এসে যাবে।

একটু বাদেই ভারতী এসে যায়। বয়সে নিতান্তই তরুণী। বুঝতে পারি, ফোনে 'তুমি' বলে কোন ভুল করি নি।

ষ্টক্‌হোম বিশ্বের একটি সুন্দরতম আধুনিক মহানগরী। শহর এবং শহরতলীতে অসংখ্য দর্শনীয় স্থান রয়েছে। রয়েছে বিশ্ববিখ্যাত সুইডিশ আকাদেমি, সিটি হল, কালচার সেণ্টার, বিভিন্ন রাজপ্রাসাদ ও দুর্গ, রয়েছে পঞ্চাশটি মিউজিয়াম ও বহু গ্রন্থাগার। আমি মাত্র কয়েকটা দিন ষ্টকহোমে ছিলাম। তারই মধ্যে ওঁরা আমাকে যতটা সম্ভব দেখিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা সুইডেন প্রবাসী বাঙালীদের কাছ থেকে আমি যে ভালোবাসা পেয়েছি, তা অতুলনীয়। আর সেই কথা লেখার জন্যই আজ কলম নিয়ে বসেছি, সুইডেনের কথা আরেক দিন বলা যাবে।

সুজিতবাবু আমাদের বাড়ি পেঁছে দিয়ে অফিসে চলে গেলেন। ঠিক হয়েছে, লাঞ্চের পরে আমি ভারতীর সঙ্গে বেড়াতে বের হব। ছ'টার মধ্যে বাড়ি ফিরে আসব। ছ'টায় সুজিতবাবু আবার আসবেন, মিহিরও এসে যাবে। আমরা চা খেয়ে সুজিতবাবুর গাড়িতে আবার ষ্টক্‌হোম দেখতে

যাবো।

লাঞ্চের টেবিলে এমন চমকে উঠতে হবে আগে জানতাম না। সবিস্ময়ে বলে উঠলাম—সে কি? ইলিশ মাছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ভারতী বলে—পদ্মার ইলিশ।

—কোথায় পেলে?

ভারতী জবাব দেয়—বাড়ির নিচের তলায় একটা বাংলাদেশী দোকান হয়েছে, সেখানে ইলিশ মাছ থেকে সজনে ডাঁটা পর্যন্ত সব কিছু পাওয়া যায়। গত চালানের একটি মাছ আমরা নিয়েছি, আরেকটা গজেনদা গোথেনবার্গে নিয়ে গিয়েছেন। আপনি আসবেন বলে মাছটা এ ক'দিন রেখে দিয়েছিলাম।

আমি বরিশালের বাঙাল। সুতরাং সুদূর সুইডেনে বসে পদ্মার ইলিশ পাতে পরিবেশনের জন্য ভারতীকে ধন্যবাদ দিতে হয়।

ধন্যবাদ অবশ্য সবাইকেই দিয়েছি—সুজিৎবাবু মিহির ও তার বন্ধু সুবজিৎ এবং দীপঙ্কর সেনগুপ্তকে। এই বাঙালী যুবক আমার আগমন উপলক্ষে সবাইকে নেমন্তন্ন করে খাইয়েছেন। অথচ তাঁর সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়।

আমাকে স্টক্‌হোম দেখাবে বলে মিহির অফিস ছুটি নিয়েছে। সুজিতবাবুর ফ্ল্যাটটি বড়। তাই রাতে তিনি আমাকে বাড়ি নিয়ে যেতেন। পরদিন সকালে মিহির সেখানে চলে আসত। আমরা বেড়াতে বের হতাম।

একদিন কথায় কথায় সুজিতবাবু বললেন—এখানকার জাতীয় গ্রন্থাগারে আপনার কয়েকখানি বই আছে। এ দেশের নিয়ম হ'ল, গ্রন্থাগারে আপনার বই যতবার 'ইস্যু' হবে, আপনি সেই গ্রন্থাগার থেকে তার ওপরে একটা 'রয়্যালটি' পাবেন। আমরা স্টক্‌হোমের বাঙালীরা সবাই আপনার বইগুলি এনে পড়েছি। কাজেই এখানে আপনার কিছু রয়্যালটি পাওনা হয়েছে, দেখি

আদায় করে দেওয়া যায় কিনা ?

তাড়াতাড়ি বলে উঠি—না, না, এসব হাঙ্গামা করে আপনি বৃথা সময় নষ্ট করবেন না।

সুজিতবাবু উত্তর দেন—এটা আপনার 'অনারেরিয়াম', আপনার ন্যায্য পাওনা। আপনি ছেড়ে দেবেন কেন ?

অতএব আমাকে নীরব থাকতে হল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল না। কেবল সুজিতবাবুর দৌড়াদৌড়ি সার হল। কারণ, জাতীয় গ্রন্থাগার খোলা থাকলেও গ্রীষ্মের ছুটির জন্য গ্রন্থাগারের অ্যাকাউন্টস অফিস বন্ধ এবং আমার স্টক্‌হোম থাকার মধ্যে অফিসটি খুলছে না।

সুজিতবাবু দুঃখ করে বললেন—টাকাটা যে আপনাকে পাঠিয়ে দেব, তার উপায় নেই। কারণ ওঁরা এ টাকা দেশের বাইরে পাঠান না। আপনি যদি আর কখনও এদেশে আসেন, আগের থেকে জানাবেন, আমি আপনার রয়্যালটি পাবার ব্যবস্থা করে রাখব।

অবশেষে ওদের কাছ থেকে বিদায় নিতে হল। মিহির ও তার মস্কো প্রবাসী বন্ধু সুরজিৎ স্টেশনে এসে আমাকে গোথেন-বার্গের ট্রেনে তুলে দিল।

স্টক্‌হোম সুইডেনের রাজধানী ও বৃহত্তম মহানগরী। গোথেন-বার্গ সুইডেনের দ্বিতীয় শহর। দুটি শহরই মধ্যসুইডেনের বন্দর-নগরী কিন্তু দেশের দুই প্রান্তে অবস্থিত। স্টক্‌হোম পূর্বপ্রান্তে বালটিক সাগরে আর গোথেনবার্গ দেশের পশ্চিমপ্রান্তে উত্তর-সাগরতীরে। অর্থাৎ আমি সুইডেনের পূবদিক থেকে পশ্চিমদিকে চলে এলাম। সময় লাগল সাড়ে চার ঘণ্টা।

বলাবাহুল্য গজেনবাবু নিজে ষ্টেশনে এসেছেন। ছোটখাটো মানুষটিকে দেখেই বুঝতে পারছি, তিনি অতিশয় উৎসাহী ও কর্মঠ।

গাড়িতে বাড়ি আসার পথেই তাঁর সাহিত্যপ্রীতির পরিচয় পেয়ে প্রীত হলাম।

বাড়িতে এসে পরিচয় হল মিসেস ঘোষের সঙ্গে। শুধু সুগৃহিণী নন, খুব ভাল চাকরি করেন। দুটি ছেলে-মেয়ের জননী। দুজনেই কিশোর-কিশোরী, কলেজে পড়ে। গজেনবাবু স্বীকার করলেন তাঁর সাহিত্য ও শিল্প সাধনার প্রধান পরামর্শদাত্রী মিসেস ঘোষ। গজেনবাবু শুধু সুলেখক নন, একজন চিত্রশিল্পীও বটে।

চা খাবার পরেই গজেনবাবু বলে বসলেন—আপনি হিমালয়-প্রেমিক, পাহাড় ও জঙ্গলকে ভালোবাসেন। আমাদের এই গোথেনবার্গ শহরের উপকণ্ঠেও পাহাড় জঙ্গল আর হ্রদ রয়েছে, চলুন বেড়িয়ে আসা যাক।

রাতে খাবার পরে গজেনবাবু বললেন—আসুন, আপনার কণ্ঠস্বরটা রেকর্ড করে রাখি।

তিনি টেপ্ রেকর্ডার ঠিক করে বলেন আপনি আমার সঙ্গে সাধারণ ভাবে কথা বলে যান। আগামীকাল ইলিশ মাছ কাটা ও খাওয়ার সময় ভি, ডি, ও তোলা যাবে।

ইলিশ মাছ! আমি আবার বিস্মিত হই।

গজেনবাবু উত্তর দেন আজ্ঞে হ্যাঁ, পদ্মার ইলিশ। স্টক্‌হোম থেকে নিয়ে এসেছিলাম। আপনি আসবেন বলে রেখে দিয়েছি।

একটু হেসে বলি - ভারতীও তাই করেছে। সেও আমাকে ইলিশ মাছ খাইয়েছে।

আগামীকাল এখানেও খাবেন। একবার থামেন গজেনবাবু। তারপরে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলেন—আমার এখানে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের সবার কণ্ঠস্বর ধরে রেখেছি। আপনার রেকর্ডিং শেষ করে আমি আপনাকে প্রবোধদার কণ্ঠস্বর শোনাবো। তিনি

একটা আবৃত্তিও করেছিলেন।

প্রবোধদার কথা ও আবৃত্তি শুনে যেমন ভাল লাগল, তেমনি মনটা ভারী হয়ে উঠল। দু'বছর হয়ে গেল এই স্নেহময় মানুষটির উদাত্ত কণ্ঠস্বর চিরকালের মতো স্তব্ধ হয়ে গেছে। গজেনবাবুকে ধন্যবাদ, সুদূর সুইডেনে বসে তিনি আমাকে প্রবোধদার কণ্ঠস্বর শোনালেন।

প্রবোধদার প্রসঙ্গ থেকে 'উত্তর-প্রবাসী'র কথা উঠল। গজেনবাবু অনেকগুলো সংখ্যা দেখালেন। সেই সঙ্গে বলতে থাকলেন তাঁর সাহিত্য-সেবার কথা—দু-তিন বছর বাদে বাদে তাঁরা কেউ কলকাতায় গিয়ে পত্রিকার পুরস্কার বিতরণ করে আসেন।

সুইডেনে বসে বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করা কঠিন কাজ। প্রথম অসুবিধে ভাল লেখা, দ্বিতীয় সমস্যা টাকাপয়সা, তৃতীয়টি মুদ্রণ সমস্যা। শেষের সমস্যাটির এঁরা সমাধান করেছেন অভিনব উপায়ে। পাণ্ডুলিপির ফটোকপি করে নিয়ে সেগুলো বাঁধিয়ে এঁদের পত্রিকা তৈরি হয়। যেসব লেখকের হাতের লেখা অপাঠ্য, তাঁদের লেখা আবার লিখে নিতে হয়। বিভিন্ন বাংলা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সুইডেন সম্পর্কীয় রচনা উত্তর-প্রবাসীতে পুনরায় প্রকাশিত হয়।

তবে কেবল গজেনবাবু একাই এই অভিনব মুদ্রণ পদ্ধতির আশ্রয় নেননি। পশ্চিম জার্মানী থেকে প্রকাশিত 'অয়রোপা', লণ্ডন থেকে প্রকাশিত 'সাগরপারে', আমেরিকা থেকে প্রকাশিত 'অতলান্তিক' ও কানাডা থেকে প্রকাশিত 'আমরা' এই একই পদ্ধতির অবলম্বন করে পত্রিকা প্রকাশ করছেন। শুনেছি য়ুরোপ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী বাঙালীরা এমন আরও অনেক পত্রিকা প্রকাশ করে চলেছেন। আমার সেসব পত্র-পত্রিকা দেখার সৌভাগ্য হয় নি এখনও।

কিন্তু অন্যদের কথা থাক, উত্তর-প্রবাসীর কথাতেই ফিরে আসা যাক। সত্যই গজেনবাবু ও তাঁর সহযোগীরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্য অসাধারণ কাজ করে চলেছেন। শুধু সুইডেন নয়, ফিনল্যাণ্ড ডেনমার্ক নরওয়ে প্রভৃতি প্রতিবেশী দেশসমূহেব বাঙালীদেরও তাঁরা এই পত্রিকার মাধ্যমে একত্রিত করে তুলেছেন। একদিকে তাঁরা যেমন য়ুরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন সাহিত্যেব অনুবাদ প্রকাশ কবছেন, তেমনি কলকাতার বর্ষা ও ঢাকাব শরতের কথাও বাদ দিচ্ছেন না। কারণ তাঁরা বিশ্বাস করেন, কলকাতা ও ঢাকা বঙ্গ-সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে গজেনবাবুর সঙ্গে গোথেনবার্গ দেখতে বের হলাম। বট্যানিকাল গার্ডেনস ও কালচারাল সেণ্টার দেখে বাড়ি ফিরে এলাম। ফেরার পথে দেশের কথা উঠল। কথায় কথায় গজেনবাবু বললেন—সুইডেন, শুধু সুইডেন নয়, সারা যুরোপের এত উন্নতির মূলে তিনটি জিনিস।

আমি তার মুখের দিকে তাকাই। তিনি গাড়ি চালাতে চালাতে বলে চলেন এঁরা দেশকে ভালোবাসেন, কখনও নিজের কাজে ফাঁকি দেন না এবং সর্বদা আইন মেনে চলেন।

একবার থামেন তিনি। তারপবে আবার বলেন– সুইডেন পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ ধনী দেশ। কিন্তু শুনে অবাক হবেন, এদেশেব প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত বাড়ি থেকে অফিসে আসা–যাওয়ার জন্য গাড়ি পান না। নিজের গাড়ি নিজেকে চালিয়ে অফিসে আসতে হয়। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী গাড়ি চালাতে খুব পছন্দ করেন না বলে, মাঝে মাঝে মেট্রো করে অফিসে যাতায়াত করেন। এবং মেট্রোতে বসার জায়গা না পেলে ব্রীফ্‌কেস হাতে দাঁড়িয়ে থাকেন।

—সে কি! এ তো আমাদের কল্পনাতীত।

—হ্যাঁ। কারণ আমরা দরিদ্র ভারতের মানুষ, আমরা

কেবল চিৎকার করে বলছি ভারত পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র, একবার থামেন গজেনবাবু। তারপরে আবার বলতে থাকেন —সুইডেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী একদিন ট্রাফিক রুলস ভঙ্গ করার জন্য এক'শ ক্রোনার (সুইডেনের টাকা, আমাদের প্রায় দেড় টাকার সমান) ফাইন দিয়েছিলেন। একজন সাধারণ পুলিস তাঁর গাড়ির পথ অবরোধ করে তাঁর হাতে ফাইনের কাগজটি ধরিয়ে দিয়েছে।

বাড়িতে ফিরে এসে দেখি উত্তর-প্রবাসীর অন্যতম কর্মকর্তা অধ্যাপক সমীর মিত্র বসে আছেন। বয়সে আমার চেয়ে কিছু ছোট। আমেরিকা থেকে পোস্ট ডক্টরেট করে এখানে এসে অধ্যাপনা করছেন। বহুদিন হ'ল সুইডেনে আছেন।

সর্ষেবাটা দিয়ে ইলিশমাছ রান্না করেছেন মিসেস ঘোষ। সুইডেনে থাকলে কি হয়, সমীরবাবু দেখছি আমার চেয়ে বড় বাঙাল। তিনি উল্লাসে আটখানা।

খাবার পরে সমীববাবুর সঙ্গে তাঁর মার্সেডিজ গাড়ীতে করে বেরিয়ে পড়ি পথে। কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরির পরে আমরা লিজেবেবি (Liseberg) দেখতে এলাম। আমেরিকার ডিজ্‌নীল্যাণ্ড-এর অনুকরণে নির্মিত লিজেবেবি সুইডেনের সর্বশ্রেষ্ঠ পর্যটক আকর্ষণ-কেন্দ্র। সমতল ও পাহাড় নিয়ে গঠিত এই সুবিশাল পার্কটিতে বছরে পঁচিশ লক্ষ দর্শক আসেন। বিভিন্ন ধরণের যন্ত্রচালিত নৌকো, মোটর, ট্রেন, নাগরদোলা প্রভৃতি প্রধান আকর্ষণ।

কিন্তু আগেই বলেছি, এটা আমার ভ্রমণকাহিনী নয়, স্মৃতি-আলেখ্য সুতরাং লিজেবেরির কথা থাক, সমীরবাবুর কথায় ফিরে আসা যাক।

সারা দুপুর আর বিকেল ঘোরাঘুরির পরে সন্ধ্যা নাগাদ সমীর-বাবুর ভাইপো সোনার ফ্ল্যাটে এলাম। তার পোলিশ স্ত্রী মারিয়া

রান্না করে সযত্নে ডিনার খাওয়ালো। ভারী ভাল লাগলো ওদের দুজনকে।

সেদিন রাতটা আমি সমীরবাবুর ফ্ল্যাটেই কাটালাম। পরদিন সকালে ব্রেকফাস্টের টেবিলে বসে তাঁর সঙ্গে নানা গল্প হল। তাঁর এবং গজেনবাবুর বৃত্তি ভিন্ন কিন্তু একটা বিষয়ে ওঁদের দুজনের আশ্চর্য মিল। আর ওঁদের দুজনের কথাই বা বলি কেন? সুইডেনে এসে যে ক'জন বাঙালীর সঙ্গে পরিচয় হল, তাঁদের সবারই এই একটা বিষয়ে আশ্চর্য মিল রয়েছে। বিষয়টি হল এরা বাংলার মাটি থেকে এতদূরে বাস করেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি ভালবাসা হারিয়ে ফেলেন নি।

কথায় কথায় সমীরবাবু বললেন—দু-তিন বছর বাদে বাদে দেশে যাই। নৈহাটিতে আমাদের বাড়ি। বাড়ির লোক ও বন্ধুবান্ধবদের জন্য সাধ্যমত ইলেক্‌ট্রোনিক্‌স জিনিসপত্র ও যন্ত্রপাতি নিয়ে যাই। কিন্তু আসার সময় কেবল দুটি জিনিস নিয়ে আসি।

আমি তাঁর মুখের দিকে তাকাই। জিজ্ঞেস করি—কী?

মৃদু হেসে সমীরবাবু উত্তর দেন বাংলা গানের ক্যাসেট আর বাংলা বই।

এই মানসিকতাই সুইডেন ভ্রমণে আমাকে সবচেয়ে বেশি আনন্দ দান করেছে। আর বোধ করি এই মানসিকতার জন্যই আমি অপরিচিত মানুষগুলোর এমন অকৃত্রিম ভালোবাসা পেয়ে এলাম। বাংলাকে ভালোবাসেন বলেই ওঁরা আমাকে ভালোবেসেছেন। কারণ নিতান্ত নগন্য হলেও আমি যে বাংলা ভাষারই একজন লেখক।

———

# গাড়োয়ালের তমসা উপত্যকা

এ তমসা কিন্তু 'ছন্দবাণবিদ্ধ বাল্মীকি'র তমসা নয়। এ তমসা যমরাজ-ভগিনী যমুনার সখী। এ তমসা স্বর্গারোহিণীর অমৃতধারা। এ তমসা গাড়োয়াল-হিমালয়ের একটি অপরূপ উপনদী।

ভারতে তিনটি তমসা আছে। ইংরেজরা এ তিনটি নদীকেই নাম দিয়েছেন 'টন্‌স'। প্রথমটি অযোধ্যায়—সরযূর শাখানদী বাল্মীকির তমসা। সে আজমগড়ের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ভুলিয়ার কাছে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। দ্বিতীয়টি মধ্যপ্রদেশে—রেওয়া জেলার একটি নদী। তৃতীয়টি উত্তরকাশী জেলার এই তমসা। দেরাদুন জেলার কালসির কাছে জালালিয়াতে যমুনায় মিশেছে।

তমসা ও যমুনার সঙ্গমকে বলে হরিপুর-ব্যাস। কথিত আছে হৈহয় জাতির জনক কার্তবীর্যার্জুনের পিতামহ একবীর এই সঙ্গমের কাছে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাই হরিপুর-ব্যাস একটি পরম-পবিত্র তীর্থ।

গতকাল থেকে শুরু হয়েছে আমাদের পদ-পরিক্রমা। বাস-পথের প্রান্তসীমা পুরোলা (৫৫০০´) থেকে আরম্ভ হয়েছে এই পদযাত্রা।

পুরোলা একটি নির্মীয়মান জনপদ। জেলাসদর উত্তরকাশী

থেকে ৭৪ মাইল। ঋষিকেশ ও দেরাদুনের সঙ্গে নিয়মিত বাস যোগাযোগ রয়েছে। ঋষিকেশ থেকে পুরৌলা আসতে হলে যমুনোত্রীর বাস ধরে পৌঁছতে হয় বারকোট। সেখান থেকে পুরৌলার বাস পাওয়া যায়। দূরত্ব মাত্র ১০ মাইল। তবে দেরাদুন থেকেই পুরৌলা আসা সবচেয়ে সহজ। দূরত্ব ৭০ মাইল —নিয়মিত বাস চলাচল করে। আমরা এসেছি অনেক ঘুরে— উত্তরকাশী হয়ে। পর্বতারোহণের সাজ-সরঞ্জাম ও কুলি সংগ্রহের জন্য আমাদের উত্তরকাশী যেতে হয়েছিল। আমরা যে পর্বতাভিযানে চলেছি। কলকাতার পর্বতারোহণ সংস্থা 'দূতাগার' এই অভিযানের আয়োজন করেছে। প্রখ্যাত পর্বতারোহী অমূল্য সেন অভিযানের নেতৃত্ব করছে।

পুরৌলা থেকে পদযাত্রা আরম্ভ করে ৮ মাইল হেঁটে গতকাল রাতে আমরা পৌঁছেছি জারমোলা (৫৬৭৬´)। সেখানকার বন-বিশ্রামভবনে রাত কাটিয়ে আজ সকালে রওনা হয়েছি নৈটয়ারের পথে। জারমোলা থেকে নৈটয়ার ১২ মাইল। ৬ মাইল এসে মোরি—তমসা উপত্যকার একটি সমৃদ্ধ জনপদ। মোরি থেকে তমসার তীর দিয়ে একটি পথ চলে গিয়েছে তিউনি। জীপ যাতায়াত করে। তিউনি থেকে বাস যায় চাকরাতা—দেরাদুন জেলার মহকুমা সদর।

মোরি বাজার ছাড়িয়ে কয়েক মিনিট হেঁটেই আমরা পৌঁছেছি তমসার তীরে। জারমোলা থেকে এতক্ষণ আমরা উত্তরে এসেছি, এবারে শুরু হল পূর্বদিকে পদযাত্রা। তমসা এখানে পশ্চিমপ্রবাহিনী। সে চলেছে সঙ্গমে, আর আমরা চলেছি তার উৎসে। চলেছি আর দু'চোখ ভরে দেখছি। দেখছি আর মনে মনে বলছি— তমসা তুমি সত্যিই সুন্দরী! তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে আজ আমাদের সকল শ্রম সার্থক হল, আমরা ধন্য হলাম।

যমুনার উপনদী বলেই হয়তো তমসাও নীলাঞ্জনা। তার সারা শরীরে নীলকান্তমণির মূর্ছনা। আমরা সেই অপরূপা উপনদীর রূপমাধুরী দেখতে দেখতে পথ চলেছি।

তমসার বাঁ-তীর দিয়ে পথ। পাইন আর দেওদারে ছাওয়া পথ ও তমসার মাঝে ক্ষেত।

শুধু এপারের বেলাভূমিতে নয়, ওপারেও ক্ষেত-খামার। ক্ষেতের রঙ কোথাও লাল, কোথাও সোনালী, আবার কোথাও বা শুধুই সবুজ।

ক্ষেতের শেষে বনের ধারে কিংবা পাহাড়ের ঢালে, কাঠ ও পাথরের সারি সারি ঘর—পাহাড়ী গ্রাম। নারী পুরুষ ও ছেলে-মেয়ের দল রঙিন পোষাক পরে কাজকর্ম করছে- কেউ বা তাকিয়ে তাকিয়ে আমাদের দেখছে। কি ভাবছে কে জানে? কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, অকৃপণ প্রকৃতি আমাদের জন্য এখানে কয়েকটি পহেলগামকে পাশাপাশি সাজিয়ে রেখেছেন।

প্রাণেশও একই কথা বলে। প্রখ্যাত পর্বতারোহী প্রাণেশ চক্রবর্তী। সে আমার পাশে পাশে পথ চলেছে। আমাদের আগে আগে যাচ্ছে সহনেতা বিভাস দাস, সাংগঠনিক সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ পণ্ডিত ও জগন্নাথ দত্ত, ওরফে মামা। পেছনে জুওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার জুওলজিস্ট দিলীপকুমার মণ্ডল ও তার সুযোগ্য সহকারী বচন সিং। অন্যান্য সহযাত্রীরা এগিয়ে গিয়েছে।

যাক গে, যে-কথা বলছিলাম। প্রাণেশও একই কথা বলে, 'সত্যি শঙ্কুদা ভারী সুন্দর এই তমসা উপত্যকা। গৌরীগঙ্গা উপত্যকা ছাড়া এমন অপূর্ব-সুন্দর উপত্যকা আমি আর কোথাও দেখি নি।'

ঠিকই বলেছে প্রাণেশ। তমসা উপত্যকার সৌন্দর্যের সঙ্গে

একমাত্র পিথোরাগড় জেলার মুনসীয়ারী মহকুমায় গৌরীগঙ্গা উপত্যকার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। কিন্তু কথাটা সে না বললেই ভাল করত। গৌরীগঙ্গা সুন্দরী হলেও নিষ্ঠুরা। সে আমাদের ওপর বড়ই নির্দয় আঘাত হেনেছে—অনিমাদিকে চিরকালের মত ছিনিয়ে নিয়েছে। ট্রেল্‌স গিরিবর্ত্ম (১৭,৭০০´) অভিযান থেকে ফেরার পথে লিলামের (৬০০০´) কাছে গৌরী-গঙ্গা তীরে ধসের কবলে পড়ে (২রা অক্টোবর, ১৯৬৪) শহীদ হয়েছেন অনিমাদি—শ্রীমতী অনিমা সেনগুপ্ত।

'ওখানে কে? শম্ভুদা নন!'

বিভাসের আকস্মিক প্রশ্নে বর্তমানে ফিরে আসি। তাড়াতাড়ি সামনে তাকাই।

তাই তো মনে হচ্ছে। পথের পাশে ছোট একটি নালার ধারে কয়েকজন স্থানীয় লোকের সঙ্গে বসে রয়েছে শম্ভু—আমাদের অভিযানের সমীক্ষক, ভবঘুরে ও ছন্নছাড়া শম্ভুনাথ দাস।

আমাদের ইচ্ছে আছে, হিমালয়ের এই অপরিচিত ও অনগ্রসর অঞ্চলের একটা সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সমীক্ষা করব। এবং সে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে শম্ভুকে। তাই বোধহয় সহযাত্রী সুশান্তবাবু, সুশীল, নির্মল, দেশাই ও দাদুকে নৈটয়ারের পথে এগিয়ে যেতে বলে নিজে স্থানীয়দের সঙ্গে আড্ডায় বসে গেছে।

আমরা কাছে আসতেই শম্ভু জিজ্ঞেস করে, 'এত দেরি হল যে?'

কেউ কোন উত্তর দিতে পারার আগেই বিভাস বলে ওঠে, 'মণ্ডল প্রজাপতি ধরছিল।'

'এ তোমার অন্যায় বিভাস! অমূল্যদা যতক্ষণ না এসে পৌঁছচ্ছেন, ততক্ষণ তুমিই অভিযানের নেতা। তোমার পক্ষে পণ্ডিতের মত লায়ার হওয়া সাজে না।' মণ্ডল আপত্তি করে।

'ওরে বেটা! আমি লায়ার?' পণ্ডিত প্রতিবাদ করে ওঠে।

'লায়ার নয় তো কি? তুমি কি আমার ডাইরেক্টরকে বলেছ যে তোমাদের সঙ্গে এলে এমনি চড়াই-উৎরাই করতে হবে? আমার পায়ে ফোস্কা পড়বে, গায়ে ব্যথা হবে? মিথ্যে কথা বলেই তো তুমি আমাকে এই প্যাঁড়াকলের মধ্যে নিয়ে এসেছ।'

সঙ্গে একজন জুওলজিস্ট নিয়ে আসবার আইডিয়াটা প্রথম পণ্ডিতের মাথাতেই আসে। সে-ই দিলীপের ডাইরেক্টরের সঙ্গে দেখা করে সব ব্যবস্থা করেছে। সুতরাং তার যাবতীয় দুঃখ-কষ্টের জন্য মণ্ডল পণ্ডিতকে দায়ী করে চলেছে।

মণ্ডল সরকারীভাবে আমাদের সঙ্গী হয়েছে। তার গবেষণার বিষয়বস্তু, উচ্চতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কীট-পতঙ্গের বিবর্তন সম্পর্কে অনুশীলন করা। আর এই অনুশীলনের প্রধান উপকরণ প্রজাপতি। অতএব প্রজাপতি ধরা দিলীপকুমারের প্রধান কর্তব্য।

এই কর্তব্য সম্পাদনের পদ্ধতিটিও অভিনব। সহকারী বচন সিংয়ের পিঠে রয়েছে দিলীপের হ্যাভারস্যাক্। তার ভেতরে আছে 'কিলিং বট্‌ল' সহ কীট-পতঙ্গ এবং প্রজাপতি নিধন ও সংরক্ষণের যাবতীয় সরঞ্জাম। আর দিলীপের হাতে প্রজাপতি ধরার জাল।

জালটিও বিচিত্র। দেখতে অবিকল টেনিস-র‍্যাকেটের মত, কেবল তাতে স্ট্রিংয়ের পরিবর্তে লম্বা ও সরু পাতলা কাপড়ের একটা থলি। প্রজাপতি দেখতে পেলেই দিলীপ সেই জাল নিয়ে তার পেছনে ছোটে। বিশ্বস্ত অনুচর বচন তাকে অনুসরণ করে।

একসময়ে বেচারী প্রজাপতি দিলীপের ফাঁদে ধরা পড়ে। মণ্ডল আনন্দে চিৎকার করে ওঠে—'বচন, কিলিং বট্‌ল নিকাল্!'

বলা বাহুল্য কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রজাপতিটি সদগতি লাভ করে। আর দিলীপ তার আত্মাকে সান্ত্বনা দিতে থাকে—

'তোর অনেক ভাগ্যি রে অনেক ভাগ্যি! তুই জেড. এস. আই-য়ে যেতে পারছিস…'। জেড. এস. আই মানে জুওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া।

শুনেছি সেকালে যখন দেবতার নামে নরবলি দেওয়া হত, তখনও নাকি ঘাতকরা একই ধরনের কথা বলত— 'তোর অনেক ভাগ্যি রে অনেক ভাগ্যি! তুই দেবতাব চরণে আত্মদান করে সোজাসুজি স্বর্গে চলে যেতে পারছিস।'

কিন্তু দিলীপের কথা এখন থাক, শম্ভুব প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। তাকে প্রশ্ন করি, তুমি এখানে কতক্ষণ?'

'তা প্রায় ঘণ্টা তুয়েক।' শম্ভু উত্তর দেয়।

'কি করছিলে?'

'আর বল কেন, পথ চলতে চলতে আলাপ হল ওদের সঙ্গে।' সে গ্রামবাসীদের দেখিয়ে দেয়। বলে চলে, 'কথায় কথায় বলতে হল যে আজ আমার খাওয়া হয় নি। অমনি আমাকে এখানে অন্যদের সঙ্গে গল্পে বসিয়ে, একজন ছুটল তার ঘরে—নিচের ঐ গ্রামে। কিছুক্ষণ আগে সে রুটি ও আলুসিদ্ধ নিয়ে এল। তাই দিয়ে ভুরিভোজ সেরে উঠব উঠব করছিলাম, এমন সময় দেখতে পেলাম তোমাদের।' একবার থামে শম্ভু, তারপর প্রশ্ন করে, তোমাদেরও তো খাওয়া জোটে নি।'

'জুটেছে। পণ্ডিত মোরির এক দোকানীর স্ত্রীকে মা ডেকে ম্যানেজ করেছে।' গল্পটা বলি তাকে। সে খুশি হয়।

সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা বিদায় নিই সেই অতিথি-পরায়ণ গ্রামবাসীদের কাছ থেকে। তারপর তমসার তীর ধরে এগিয়ে চলি নৈটয়ারের পথে। মোরি থেকে নৈটয়ার ৬ মাইল। আমরা মাত্র মাইলখানেক পথ পেরিয়েছি।

জীপ চলাচলের উপযুক্ত প্রশস্ত পথ। এদিকটায় এখনও

বাসপথ তৈরির কাজ শুরু হয় নি। তাই আঁকাবাঁকা মসৃণ পথ। সামান্য চড়াই-উৎরাই।

সারি বেঁধে এগিয়ে চলেছি আমরা। হিমালয়ের নিয়মমত সবার আগে চলেছে খচ্চরের দল। না, তারা আজ আর কোন খচরামি করছে না। কেন করবে? তাদের পিঠের বোঝা হালকা করে দেওয়া হয়েছে যে!

আমাদের মালপত্র বইবার জন্য চুয়াল্লিশজন কুলি ও দশটি খচ্চর সঙ্গে নিতে হয়েছে। কুলিরা রয়েছে পেছনে কিন্তু খচ্চরের দল এগিয়ে গিয়েছে। তাই তো যাবে। হিমালয়ের ট্রাফিক্ রুলস্-য়ের প্রথম কথা—'মিউল ফার্স্ট।'

খচ্চরদের পিছনে বিশ্বস্ত শেরপা পাসাং ও দোরজি। তাদের পেছনে দুই খচ্চরওয়ালা—বিড়ি মুখে দিয়ে হেলে-দুলে পথ চলেছে।

তারপরে বিভাস, মামা, পণ্ডিত ও মণ্ডল। তার পেছনে অনুগত সহকারী বচন সিং। সবার শেষে আমি প্রাণেশ ও শম্ভু।

কথায় কথায় শম্ভু বলে চলেছে-তমসা উপত্যকার কথা। আমি ও প্রাণেশ নীরব শ্রোতা। শম্ভু বলছে—

"মহাভারত একটি জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিহাস, লোক-শিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য। আমরা জানি, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরে ছত্রিশ বছর রাজত্ব করে যুধিষ্ঠির অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিতকে রাজ্যভার দিয়ে দ্রৌপদী ও চার ভাইকে নিয়ে মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করেছিলেন। কিন্তু জানি না তাঁরা কোন পথে স্বর্গারোহণ করেছিলেন। অনেকে বলেন, কেদারনাথের পেছনেই সেই পথ।"

'তাহলে কেদারনাথ পর্বতের নাম স্বর্গারোহিণী হল না কেন?' প্রাণেশ মাঝখান থেকে প্রশ্ন করে।

'সেইটেই প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। যদি কেদারনাথ দিয়েই স্বর্গা-

রোহণের পথ হয়ে থাকবে, তাহলে তমসা উপত্যকার প্রান্তসীমায় অবস্থিত ২০৫২১ ফুট উঁচু অনিন্দ্যসুন্দর শৃঙ্গটির নাম স্বর্গারোহিণী হল কেন?' প্রাণেশের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে শম্ভু পাল্টা প্রশ্ন করে।

আমরা চুপ করে থাকি। শম্ভু আবার বলতে থাকে, 'যুধিষ্ঠির কোন পথে সেই সারমেয় সহ স্বর্গে আরোহণ করেছিলেন, মহাভারতে তার স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও আমরা জানি, পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী হস্তিনাপুর থেকে প্রথমে পূর্বদিকে পথ চলেছিলেন। তারপরে নানা দেশ ও বহু নদ-নদী পেরিয়ে লৌহিত্য সাগরের তীরে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখান থেকে দক্ষিণদিকে যাত্রা করে তাঁরা লবণসমুদ্রের উত্তর তীর দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে গমন করেন। তারপরে আবার পশ্চিমদিকে যাত্রা করে সাগর-প্লাবিত দ্বারকা নগরী দর্শন করেন। সেখানে তাঁরা গতিপথ পরিবর্তন করেন। উত্তরদিকে অগ্রসর হয়ে 'হিমবন্তং মহাগিরিম্' অতিক্রম করে বালুকার্ণব বা মরুভূমি পেরিয়ে 'মহাশৈলং মেরু-শিখরিণাম্' মেরুপর্বতের দর্শন পান।'

'মহাভারতে তাহলে স্বর্গারোহিণীর কোন উল্লেখ নেই?' প্রাণেশ আবার প্রশ্ন করে।

'না।' শম্ভু উত্তর দেয়।

'তাহলে তো পাণ্ডবরা কেদারনাথ দিয়েই গিয়েছিলেন।'

'কেমন করে বুঝলে?'

'কেদারনাথ পর্বতের উত্তর-পশ্চিমে কীর্তি হিমবাহের বাঁ তীরে মেরুপর্বত নামে একটি শৃঙ্গ আছে। শৃঙ্গটির উচ্চতা ২১,৫৫২ ফুট।' একবার থামে প্রাণেশ। তারপরে আবার বলে, 'তবে ঐ বালুকার্ণব ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না।'

'আমিও যে ঠিক বুঝতে পেরেছি, তা নয়। তবে অনুমান করা

যেতে পারে মহাভারতকার বালুকার্ণব বলতে গোবি মরুভূমিকে বুঝিয়েছেন।'

'তাহলে তো স্বর্গারোহিণী ভারতের বাইরে হয়ে যাচ্ছে!'

'তা হচ্ছে।'

প্রাণেশ চুপ করে থাকে। শম্ভু আবার বলে, 'আমাদের এই স্বর্গারোহিণীর পাদদেশে কিন্তু যমদ্বার বলে একটি হিমবাহও আছে!'

'জানি, প্রাণেশ উত্তর দেয়, সেই হিমবাহ থেকেই সৃষ্ট হয়েছে হরকিদুন নালা—তমসার অন্যতম মূল-ধারা।'

শম্ভু পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে যায়। সে বলতে থাকে, 'পঞ্চ-পাণ্ডবের মহাপ্রস্থানের পথ যে দিক দিয়েই হয়ে থাক, এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই যে তাঁরা হস্তিনাপুর থেকে হিমালয়ে এসে-ছিলেন। আর তাই হয়তো হিমালয়ের অসংখ্য তীর্থের সঙ্গে পঞ্চ-পাণ্ডবের পুণ্যস্মৃতি অক্ষয় হয়ে আছে এবং হিমালয়ের অধিকাংশ মানুষ আজও পাণ্ডবদের দেবজ্ঞানে পূজা করে থাকেন।

'সুতরাং যখন শুনতে পেলাম, তমসা উপত্যকার অধিবাসীরা দুর্যোধন ও কর্ণের ভক্ত, তখন আমরা বিস্মিত বোধ করেছিলাম। ভুলে গিয়েছিলাম যে তাঁরাও তো পাণ্ডবদেরই ভাই এবং তাঁরা দুজনেই অকুতোভয় এবং মহাবীর—সারাজীবন ক্ষত্রিয়ধর্ম পালন করেছেন।

'দুর্যোধন সম্পর্কে আমরা মনে মনে যত অশ্রদ্ধাই পোষণ করে থাকি, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে তিনি একজন জনপ্রিয় শাসক ছিলেন। নইলে তাঁর পক্ষে সারা ভারত, এমনকি ভারতের বাইরে থেকে পর্যন্ত সৈন্যসংগ্রহ সম্ভব ছিল না। আর তোমরা তো জানো, সে ভারতযুদ্ধে বাঙালীরা কৌরবপক্ষেই যোগদান করেছিলেন।'

আমরা মাথা নাড়ি। শম্ভু বলে চলে, 'কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অসংখ্য সৈন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন, কিন্তু কৌরবপক্ষেব একাদশ অক্ষৌহিনী সৈন্য সকলে নিশ্চয়ই মাবা যায় নি। অথচ পবাজিত বীরদের অনেকের পক্ষেই হয়তো আব ঘবে ফিবে যাওয়া সম্ভব হয় নি। তখনকার দিনে পবাজিতদেব পক্ষে হিমালয়ই ছিল সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়। পূর্ববর্তী যুগেও আর্যদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে অনার্যবা অনেকেই হিমালয়ে পালিয়ে এসেছিলেন। অতএব অনুমান কবা বোধহয় অন্যায হবে না যে, পরাজিত কৌরবপক্ষীয় বীবদেব একটা বৃহৎ অংশ এই অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। তাই নৈটযার থেকে প্রায় প্রত্যেকটি বড় গ্রামে একটি করে দুর্যোধনেব মন্দিব দেখতে পাব। আর নৈটয়ারের এক মাইল ওপবে দেওড়া গ্রামে দর্শন করতে পারব কর্ণের মন্দির।'

'একি! থামলেন কেন? বলুন না, বেশ তো লাগছে শুনতে।' শম্ভুকে থামতে দেখে বিভাস বলে ওঠে। কিছুক্ষণ আগে মামা, পণ্ডিত ও বিভাস আমাদের দলে যোগ দিয়েছে। শুধু তারা নয়, মণ্ডলও তার খোঁড়া পা নিয়ে আমাদেব সঙ্গে সমানতালে হেঁটে চলেছে।

একটু হেসে শম্ভু পকেট থেকে সিগারেট বের করে। সিগারেট ধরিয়ে একটা টান মেরে সে আবার বলতে থাকে, 'এ অঞ্চলটার ভৌগোলিক নাম ফতে পর্বত অথবা উচ্চ-তমসা তথা 'আপার টন্‌স'। এ অঞ্চলের অধিবাসীদের বলে রাওয়াই। আর নিম্ন-তমসা তথা চাকরাতা অঞ্চলের অধিবাসীরা হলেন জৌনসারী। তাঁরা পাণ্ডব-ভক্ত। তাঁদের কাছে দুর্যোধন ও কর্ণ-ভক্তরা হলেন শত্রুপক্ষীয়। বলা বাহুল্য, সেই সুদূর অতীত থেকেই এঁদের মাঝে বিরোধ লেগে আছে। তাহলেও বলব এঁরা উভয়েই এক মহাভারতীয়

সভ্যতার উত্তর-সাধক। মহাকালের প্রভাব এড়িয়ে, আধুনিক সভ্যতাকে অস্বীকার করে খাওয়াই ও জৌনসারীরা হিমালয়ের এই তমসাচ্ছন্ন অঞ্চলে মহাভারতের ট্রাডিশনকে বহন করে চলেছেন। এক টুকরো মহাভারতীয় সমাজ যেন এখানে একই অবস্থায় যুগ যুগ ধরে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সুতরাং নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে তমসা উপত্যকা আপন মহিমায় মহিমান্বিত।'

'অথচ আমরাই নৃতত্ত্ব বিভাগের ক্যামেরাম্যান সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে প্রথম এ অঞ্চলে এলাম।' পণ্ডিত সগর্বে ঘোষণা করে। সে আমাদের সাংগঠনিক সম্পাদক।

'হ্যাঁ।' এবারে কথা বলি আমি, 'এ অঞ্চলটা চিরকালই অবহেলিত। অথচ তার মানে এই নয় যে এদিকে কারও নজর পড়ে নি। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল থেকেই ইংরেজদের তমসার দিকে নজর পড়েছে। তাই ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে প্রখ্যাত ব্রিটিশ সার্ভেয়ার বাদারফোর্ড লিখেছেন, 'The Tonse.. by telescope appeared triple the size of the Jumna'...তমসা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য —'this remarkable and yet unknown river...'

'কিন্তু তখন ধারণা ছিল, তমসা শতদ্রুর একটি শাখানদী। বহু চেষ্টা করেও বাদারফোর্ড এ সম্পর্কে কোন সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করতে পারেন নি। তাই তিনি সাব্যস্ত করেছিলেন, তমসার প্রবাহ ধরে এগিয়ে যাবেন, এর উৎস আবিষ্কার করবেন। কিন্তু তাঁর সে-আশা পূর্ণ হয় নি। কারণ এ অঞ্চল তখনও নেপালীদের অধিকারে।

'তমসা উপত্যকা চিরকালই গাড়োয়াল রাজ্যের অন্তর্গত। কিন্তু এ অঞ্চলের প্রতি গাড়োয়ালী রাজাদের কোনকালেই সুনজর ছিল না। তাই গাড়োয়ালের ইতিহাসে আমরা তমসা উপত্যকার উল্লেখ পাই না। এর একটি কারণ সম্ভবত এই যে, সে আমলে

রাজধানী শ্রীনগর কিংবা টিহরী থেকে তমসা উপত্যকার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা ছিল রীতিমত কঠিন কাজ। ফলে নেপালীরা খুব সহজেই এ অঞ্চল অধিকার করেছিলেন।

'রাজা সুদর্শন শাহর অনুরোধে ব্রিটিশরা নেপালীদের তাড়িয়ে দিলেন গাড়োয়াল থেকে। বাধ্য হয়ে রাজধানী শ্রীনগর, কেদারনাথ-বদ্রীনাথ ও দেরাদুন সহ রাজ্যের সমৃদ্ধতর অর্ধাংশ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে উপঢৌকন দিতে হল। এই অংশই পরবর্তীকালের ব্রিটিশ-গাড়োয়াল। গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী সহ বাকি অর্ধাংশ নামেমাত্র স্বাধীন রইল। ইংরেজরা গাড়োয়াল-রাজের সৈন্য সংখ্যা তিনশো তিরিশে নির্দিষ্ট করে দিলেন। তিনি টিহরীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করলেন। গাড়োয়াল রাজ্যের নাম হল টিহরী-গাড়োয়াল। ভারত স্বাধীন হবার পূর্ব পর্যন্ত এ অঞ্চল ঐ নামেই পরিচিত ছিল।

'বলা বাহুল্য, টিহরী-গাড়োয়ালে ব্রিটিশদের অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল। এবং দূরদর্শী ব্রিটিশ-শাসকরা বুঝতে পেরেছিলেন, ব্রিটিশ গাড়োয়ালের প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে টিহরী-গাড়োয়ালকে জরিপ করা দরকার। তাঁরা জানতেন যে, ব্রিটিশ-ভারতের বৈষয়িক উন্নতির জন্য টিহরী-গাড়োয়ালের দুর্গম অঞ্চলের ভৌগোলিক সমীক্ষা অপরিহার্য।

'তাই নেপালীদের সঙ্গে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত (মার্চ, ১৮১৬ খৃষ্টাব্দ) হবার আগেই প্রখ্যাত জরিপবিদ্ ক্রফোর্ডকে এ কাজের জন্য নিযুক্ত করা হল।

'ব্লেন নামে একজন প্রাক্তন ইংরেজ সৈনিককেও এই একই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এই সময় দুঃসহ দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে, কখনও জীবন বিপন্ন করে, বহু সাম্রাজ্যপ্রেমিক ইংরেজ দুর্গম হিমালয়ের জরিপ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে হজ্‌সন, ওয়েব,

জেম্‌স হারবার্ট ও রবার্ট কোলব্রুক প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা, তাঁরা কেউই উচ্চ-তমসা উপত্যকার দিকে তেমন মনোনিবেশ করেন নি। তাঁদের কেউ কেউ যমুনোত্রী থেকে ফিরে গিয়েছেন। কেউ বা রূপিন কিংবা সুপিন নদীর প্রবাহ ধরে হিমাচলের দিকে চলে গিয়েছেন।'

'রূপিন ও সুপিন বুঝি তমসার শাখানদী?' আমি থামতেই মণ্ডল প্রশ্ন করে।

কিন্তু আমাকে উত্তর দিতে হয় না। তার আগেই শম্ভু বলে, হ্যাঁ।'

'নদী দুটি কোথায়?'

'একটি এখানে, ঐ যে রূপিন দেখা যাচ্ছে। আরেকটি··'

শম্ভু শেষ করতে পারে না। আমরা সমস্বরে বলে উঠি, 'তাই নাকি? আমরা সামনের দিকে তাকাই। সে ঠিকই বলেছে. ওপারে উত্তর-পূর্বদিক থেকে একটি নদী এসে তমসায় মিশেছে।

'তাহলে যে নৈটয়ার এসে গেছে। রূপিন আর তমসার সঙ্গমেই তো নৈটয়ার।' মামা বলে।

'হ্যাঁ। মনে হচ্ছে সামনের এই বাঁকটা ছাড়ালেই নৈটয়ার দেখা যাবে।'

ঘড়ির দিকে তাকাই। বুঝতে পারি শম্ভুর অনুমান মিথ্যে নয়। ছ'টা বেজে গিয়েছে। গল্প করতে করতে চলেছি বলে, পথ ফুরিয়ে যাবার কথা টের পাই নি।

'আচ্ছা শম্ভুদা।' সুপিনের সঙ্গে আমাদের কোথায় দেখা হবে?' মণ্ডল জিজ্ঞেস করে।

শম্ভু উত্তর দেয়, 'এখানেই।'

'মানে?'

'এই তো সুপিন -আমাদের সামনে।'

'কি যে বলেন!' মণ্ডল বোকা নয়, সে বুঝতে পারে শম্ভু তার সঙ্গে রসিকতা করছে। 'এ তো তমসা!'

'হ্যাঁ কিন্তু স্থানীয়রা নৈটয়ার থেকে ওসলা পর্যন্ত তমসার যে অংশ, তাকে সুপিন বলে।'

'আর তমসা বলে কোন অংশকে?'

'নৈটয়ার থেকে মোহনা অর্থাৎ হরিপুর-ব্যাস পর্যন্ত, নদীর শেষাংশকে। তার মানে ওদের কাছে নৈটযারই তমসার জন্মভূমি, ওসলা নয়।'

মণ্ডল আর কোন প্রশ্ন করে না, কিন্তু বিভাস বলে, সুপিন নামেও তো আলাদা একটি নদী আছে।'

'আছে বৈকি।'

'কোথায়?' পণ্ডিত প্রশ্ন করে এবারে।

শম্ভু উত্তর দেয়, 'নৈটয়ার থেকে তালুকা যাবার পথে শাঁকড়ি গ্রামের কাছে দেখতে পাবে একটি পাহাড়ী নদী এসে তমসায় মিশেছে। তাকেও স্থানীয়রা সুপিন বলে।'

কয়েক পা এগিয়েই নৈটয়ারকে দেখতে পেলাম। তমসা উপত্যকার সবচেয়ে সমৃদ্ধ গ্রাম নৈটযার। উচ্চতা ৪,৬০০ ফুট। এপারে বাজার, বিশ্রাম-ভবন, বন ও নির্মাণ বিভাগের দপ্তর, আর ওপারে পাহাড়ীগ্রাম নৈটযার। খানপঞ্চাশেক ঘরে শ'দুয়েক মানুষের গ্রাম। কাঠ পাথর আর টিনের ঘর। দুতলা ঘরই বেশী, কয়েকটি তিনতলাও আছে। অন্যান্য পাহাড়ী গ্রামের মত এখানেও নিশ্চয় ঐসব ঘরের একতলা গৃহপালিত পশু, দুতলা শস্য এবং তিনতলা মানুষের জন্য নির্দিষ্ট।

আমরা ত্রস্তপায়ে এগিয়ে চলি বিশ্রাম-ভবনের দিকে। সুশান্ত-বাবু, দেশাই, সুশীল, নির্মল, দাদু ও শেরপা-পাচক কামি বহুক্ষণ আগে পৌঁছে গেছে ওখানে। তারা বোধহয় গরম চা, চিঁড়েভাজা

ও চানাচুর নিয়ে বসে রয়েছে আমাদের জন্যে।

কিন্তু মণ্ডলের জন্যে কি জোরে পথ-চলার উপায় আছে? সে পেছন থেকে চেঁচিয়ে ওঠে, 'আরে আপনারা সবাই একসঙ্গে হঠাৎ এমন ছুটতে শুরু করলেন কেন? আমার পায়ের ব্যথার কথা কি একেবারেই ভুলে গেলেন?

'না', বাধ্য হয়ে থামতে হয় আমাকে। ওরা এগিয়ে যায়।

মণ্ডল আমাকে বলে, তাহলে একটু আস্তে আস্তে চলুন।'

অগত্যা তাই চলতে হয় আমাকে।

কয়েক পা নীরবে চলার পরেই মণ্ডল আবার কথা বলে, 'এ অঞ্চলের বোধহয় এখনও তেমন ভাল করে জরিপ করা হয় নি।'

'আমারও তাই ধারণা।'

'জানেন শঙ্কুদা, কলকাতা থেকে রওনা হবার কয়েকদিন আগে কেনেথ ম্যাসনের 'এ্যাবোড অফ স্নো' মানে আপনাদের সেই 'গস্‌পেল অফ মাউন্টেনিয়ারিং' বইখানি হাতে পেয়েছিলাম। ম্যাসনও কিন্তু এ অঞ্চল সম্পর্কে তেমন কিছুই লেখেন নি।'

'কিছু লিখেছেন তাহলে?'

'তা লিখেছেন বৈকি!'

'কি লিখেছেন?'

'লিখেছেন যে—'another region still awaiting detailed mapping is at the head of the Tons river in Tehri-Garhwal, particularly on the north side of Bandarpunch (20,720´)...'

'ঠিকই লিখেছেন।'

'কিন্তু আমরা তো ঐদিকেই যাচ্ছি!'

'তা যাচ্ছি।'

'ভাল ম্যাপ না থাকলে যাব কেমন করে?'

'অনুমান, অভিজ্ঞতা ও অধ্যবসায়ের সাহায্যে।'

'যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে ?'

এবারে হাসি পায় আমার। মৃদু হেসে প্রশ্ন করি, 'ভাল মানচিত্র থাকলে কি দুর্ঘটনা ঘটতে পারে না ?'

'তা পারে। কিন্তু ম্যাপ থাকলে ভয়টা একটু কম করে, এই আর কি।'

'ভয় করলে কিন্তু পর্বতাভিযানে আসতে নেই।'

'না, না।' মণ্ডল চিৎকার করে ওঠে, 'আপনি আমাকে মোটেই কাপুরুষ ভাববেন না শঙ্কুদা! বলুন না কোথায় যেতে হবে ?'

'আপাতত ঐ বিশ্রাম-ভবনে।'

॥ দুই ॥

আজ ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭২। সাতদিন আগে আমরা কলকাতা থেকে রওনা হয়েছি। আর পুবৌলা থেকে আমাদেব পদযাত্রা আরম্ভ হয়েছে ঠিক তিনদিন আগে। আমরা আজ তালুকা যাচ্ছি। আজও বারো মাইল হাঁটতে হবে।

আটটার মধ্যে ব্রেক-ফাস্ট হয়ে গেল। শম্ভু ও সহকারী রামনাথকে নিয়ে সুশান্তবাবু গ্রামে যাচ্ছেন। তারা আজ আমাদের সঙ্গে ওপরে যাচ্ছে না, এখানেই থাকবেন। সুশান্তবাবু তাঁব ডকুমেণ্টারী তুলবেন। শম্ভু নৈটয়ারের বাসিন্দাদের সামাজিক সমীক্ষা করবে। হাতে সময় কম, তাহলেও একবার গ্রাম থেকে ঘুরে এলে হয়। আর হয়তো কোনদিন দেখা হবে না হিমালয়েব এই শান্ত সুন্দর গ্রামটিকে।

বিভাস অনুমতি দেয়, তবে বলে, 'একঘণ্টার মধ্যে ঘুরে আসবেন।'

সম্মত হই। রামনাথ, শম্ভু ও নবীন অভিযাত্রী সুশীল দে আমার সঙ্গী হয়। আমরা সুশান্তবাবুর সঙ্গে নেমে আসি বিশ্রাম-ভবন থেকে। ওদের দু-তিন দিন থাকতে হবে এখানে। ইতিমধ্যে ডাক্তার ও পান্নাকে নিয়ে অমূল্য এসে যাবে এখানে। একসঙ্গে রওনা হয়ে ওরা ওসলাতে মিলিত হবেন আমাদের সঙ্গে।

বন বিশ্রাম ভবনটি নৈটয়ারের উচ্চতম স্থানে অবস্থিত। আর গ্রামটি সবচেয়ে নিচুতে – একেবারে নদীর তীরে। বিশ্রাম-ভবনের পাশেই ফরেস্ট-রেঞ্জারের অফিস ও কোয়ার্টার। রেঞ্জার এখানকার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। সুতরাং মণ্ডল ও সুশান্তবাবুকে নিয়ে বিভাস গতকাল রাতেই তাঁর সঙ্গে দেখা করে এসেছে। তিনি তালুকা ওসলা ও হরকিদুন বিশ্রাম-ভবনে বাস করার অনুমতি-পত্র দিয়ে দিয়েছেন। তবে অনুরোধ করেছেন, ডাক্তার এখানে এসে পৌঁছলে অবশ্যই যেন তাঁর কোয়ার্টারে একবার পায়ের ধুলো দেয়—এককাপ চা খেয়ে আসে। কারণ তাঁর স্ত্রী অসুস্থা।

হতেই পারে এবং হওয়াই স্বাভাবিক। আমি এমন স্বামী খুব কমই দেখেছি, যিনি বুকে টোকা দিয়ে বলতে পারেন যে তাঁর স্ত্রী অসুস্থা নন।

কিন্তু মিসেস রেঞ্জারের কথা না ভেবে একটু সুশান্তবাবুর কথা ভাবা যাক। এমন নিরহঙ্কারী বন্ধুবৎসল সদাহাস্যময় গুণীজন এ সংসারে খুব বেশি পাওয়া যায় না। তিনি আমাদের দলের প্রবীণতম সদস্য। এখন তাঁর বয়স পঞ্চাশ বছর। কিন্তু পাহাড়ী পথ চলার সময় তা বোঝার উপায় নেই। এটি তাঁর জীবনের প্রথম পর্বতাভিযান হলেও, বহু বছর ধরেই তিনি দুর্গম হিমালয়ের পথে পথে পদচারণা করছেন।

'রূপকুণ্ড', 'কিন্নর', 'গদ্দি' ( 'ভারমৌর' ) 'লাহুল-স্পিতি', 'এ্যাবোর' ( অরুণাচল ), 'কেদার-বদ্রী' ও 'গোমুখী' প্রভৃতি

হিমালয়ের বিভিন্ন দুর্গম স্থানের ওপরে তোলা তাঁর তথ্যচিত্রগুলি বহু তরুণ-তরুণীকে হিমালয়ের প্রতি আকৃষ্ট করেছে।

এবং এর অনেকগুলি ছবি ভারতীয় তথ্যচিত্রের গৌরব। তাঁর মত একজন কুশলী ক্যামেরাম্যানকে সঙ্গে পাওয়া সৌভাগ্যের বিষয়।

নৃতত্ত্ব বিভাগের জন্য সুশান্তবাবু এ পর্যন্ত চৌত্রিশখানি শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন। তিনি ১৯৫৩ সাল থেকে এই বিভাগে রয়েছেন। তার আগে কিছুকাল কলকাতার ইন্দ্রপুরী এবং মাদ্রাজের একটি স্টুডিওতে কাজ করেছেন।

পারিবারিক জীবনে সুশান্তবাবু দুটি কন্যার জনক। স্ত্রী শ্যামলা দেবী দক্ষিণা-ভারতীয়া হলেও খুব ভাল বাংলা জানেন। তিনি একজন সুলেখিকা। সাহিত্য আকাদেমীর অনুরোধে তিনি এখন শ্রীমতী রাণী চন্দের 'পূর্ণকুম্ভ' বইখানির তামিল অনুবাদ করছেন।

সুশান্তবাবু সুলেখক কি না জানি না, কিন্তু তিনি সুবক্তা। এবং যাঁরাই তাঁর ছবি একবার দেখেছেন, তাঁরাই ভাষ্যকার সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়েছেন।

'পাহাড়ী গাঁয়ের তুলনায় জায়গাটা কিন্তু একটু বেশি জমজমাট।'

সুশান্তবাবুর কথায় সুশান্তবাবুর কথা হারিয়ে যায়। তাড়াতাড়ি উত্তর দিই, 'হ্যাঁ, এতটুকু পাহাড়ী গ্রামে এতবড় বাজার একটা দেখা যায় না।'

'শুধু কি বাজার! দেখুন নির্মাণ-বিভাগে কতবড় অফিস ও গুদাম। বন-বিভাগের অফিসটিও কাল দেখেছি, বেশ বড়।'

'বন-বিভাগের অফিস তো বড় হবেই। শম্ভু বলে, 'এটি যে ওঁদের রেঞ্জ হেড-কোয়ার্টার্স।'

'আচ্ছা পুরোলা মহকুমায় ক'টি ফরেস্ট রেঞ্জ আছে?' সুশীল

কথা বলে এতক্ষণ বাদে। সুশীল এই প্রথম পর্বতাভিযানে এসেছে। কর্মঠ ও কষ্টসহিষ্ণু সাহসী তরুণ। কয়েকদিনেই সে সকলের মন জয় করে নিয়েছে। 'বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা'র বহির্দৃশ্য গ্রহণের সময় তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। সে প্রযোজকের প্রতিনিধি হিসেবে আমাদের সঙ্গে গিয়েছিল। তারও হিমালয়ের সঙ্গে সেই প্রথম পরিচয়। আর সবার যা হয়, সুশীলেরও তাই হয়েছে—পরিচয় থেকেই প্রেম। হিমালয়ের প্রেমে পড়ে সুশীল হাবুডুবু খেতে থাকল। পর্বতাভিযানের নেশা পেয়ে বসল তাকে। তাই অমূল্য বিভাস ও পণ্ডিতকে বলে এবারে ওকে নিয়ে এসেছি সঙ্গে করে। এখন পর্যন্ত যা দেখছি, তাতে মনে হচ্ছে নাঃ ভুল করেছি।

শম্ভু সুশীলের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলতে থাকে, 'তমসা উপত্যকা বনসম্পদে সম্পদশালিনী। পুরৌলা-হরকিদুন পথে দুটি ফরেস্ট রেঞ্জ রয়েছে—সিংঘুর ও সুপিন। জারমোলা থেকে মোরি পর্যন্ত সিংঘুর রেঞ্জ। আয়তন ১৫৯.৮২ বর্গ কিলোমিটার। চীর, দেওদার ও ফার প্রভৃতি গাছের বন। আর মোরি থেকে হরকিদুন পর্যন্ত সুপিন রেঞ্জ। আয়তন, ৭০০.৩৩ বর্গ কিলোমিটার। এই বনভূমির প্রধান গাছ দেওদার, ফার ও আখরোট প্রভৃতি।'

আঁকাবাঁকা উৎরাই পথে আমরা নেমে আসি তমসার তীরে। পুল পেরিয়ে আবার চড়াই পথে এগিয়ে চলি।

গ্রাম শুরু হয়ে গেছে। বেশ-পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে গ্রাম। গাঁয়ের কর্মব্যস্ত মানুষদের সঙ্গেও দেখা হচ্ছে। তারা কেউ কাঠ কাটতে বনে চলেছে, কেউ ফসল আনতে ক্ষেতে যাচ্ছে, কেউ বা ঘরের দাওয়ায় বসে কাজ করছে। শীত আসছে। এখন ওদের অবসর কোথায়। খাদ্য ও জ্বালানী মজুত না করতে পারলে যে শীতকালে উপোস করতে হবে।

সদলবলে মোড়ল স্বাগত জানাম আমাদের। গতকাল রাতেই সুশান্তবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়েছে তাঁর। ছবি তোলাব ব্যাপারে সর্বপ্রকার সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি।

মোড়লের সঙ্গে আমরা এগিয়ে চলি গাঁয়ের পথে। আমরা এখন মন্দিরে চলেছি, সেখানেই শুটিং করবেন সুশান্তবাবু।

শুধু মোড়ল ও তাঁর পারিষদবর্গ নন, আরও কয়েকজন গ্রামবাসী সঙ্গী হয়েছেন আমাদের। তাঁদের মধ্যে বৃদ্ধ থেকে বালক, প্রবীণা থেকে নবীনা, এমন কি শিশু পর্যন্ত রয়েছে। প্রথমেই নজর পড়ছে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েগুলির দিকে। ওদেব অনেকেই যেন আমাদের মত রোগ শোক আর পাপের শরীর নয়। মনে হচ্ছে এদের দেখেই সেকালের কবিরা দেবশিশুব রূপটি বর্ণনা করে গিয়েছেন।

স্বাভাবিকভাবেই শিশুদের পরেই নজর পড়ে মেয়েদের দিকে। কিন্তু তাদের সৌন্দর্যের কথা ইতিপূর্বে একাধিকবার বলা হয়েছে আমার। সুতরাং আমি শুধু চেয়ে চেয়ে তাদের দেখি। আলোক-চিত্রশিল্পী সুশান্ত কিন্তু নীরব থাকতে পারেন না। বিনা প্রস্তাবনায় তিনি বলতে শুরু করেন, 'সত্যি বলছি শঙ্কুবাবু! আমি সারা ভারত ঘুরেছি, এমন কি ভারতের বাইরেও কয়েকটা জায়গায় গিয়েছি, কিন্তু এমন রূপসী ও স্বাস্থ্যবতী নারী আর কোথাও দেখিনি।'

আমি ঘাড় নেড়ে সমর্থন করি তাঁকে। সুশান্তবাবু আবার বলেন, 'সবচেয়ে দুঃখের কথা, সেদিন পুরৌলার তহশিলদার এদের সম্পর্কে কি মিথ্যে কথাটাই না বলেছে! আমি খোঁজখবর নিয়ে দেখেছি, তমসা উপত্যকার নারীরা তাঁদের সতীত্ব সম্পর্কে অতিশয় সচেতন। যৌনব্যাধি এখানে খুবই কম। লোকটা একটা ডাহা মিথ্যাবাদী।'

'তাতে আর সন্দেহ কি?' সুশীল বলে, 'নইলে সেদিন গায়ে পড়ে অমন সব প্রতিশ্রুতি দিয়ে ওভাবে কেটে পড়ে?'

শম্ভু সমর্থন করে তাকে, 'এই সব নীতিজ্ঞানহীন অসৎ ও মিথ্যেবাদী অফিসারদের জন্যই তো আজ দেশের এই দুরবস্থা।'

আমাদের আলোচনা আর অগ্রসর হতে পারে না। মোড়ল সুশান্তবাবুকে বলেন, 'আপনার কথা মত সব ব্যবস্থাই করে রেখেছি স্যার! তবে নাচ-গানের সেই দৃশ্যটা বিকেলের দিকে তুলতে হবে। এখন অনেকেই কাজে বেরিয়ে গেছে কি না।' গাড়োয়ালী এদের মাতৃভাষা হলেও মোড়ল বেশ ভাল হিন্দী বলতে পারেন। না পারলে বিপদ হত, আমরা কেউ গাড়োয়ালী জানি না।

'এখন গাঁয়ে কি মাত্র এই ক'জন মানুষ আছেন নাকি?' সুশান্তবাবু মোড়লকে প্রশ্ন করেন।

'হ্যাঁ, হুজুর। এমনিতেই তো তিন ভাগের এক ভাগ মানুষ এখনও গ্রামে ফেরে নি। যারা আছে, তাদেরও বেশির ভাগ চলে গেছে—ফসল কাটতে, গরু চরাতে আর কাঠ কাটতে।

'যাঁরা গ্রামে ফেরেন নি, তাঁরা কোথায় গিয়েছেন?'

'তাঁরা ভেড়া-ছাগলের পাল নিয়ে ওপরের চারণভূমিতে মানে তালাও অঞ্চলে গিয়েছে। ফিরে আসতে এখনও দিন পনেরো।'

'তালাও?' সুশীল আমার দিকে তাকায়।

'আমি বলি, 'তালাও মানে হ্রদ। বান্দরপুঁছ পর্বতমালার পাদদেশে তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরের (১১৫০০´) কেন্দ্রস্থলে চমৎকার একটি হ্রদ আছে।'

রূপিন আর তমসার সঙ্গমটিকে এখান থেকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। ওখানেই মন্দির।

শম্ভু চলতে চলতে সেই মন্দির ও তার দেবতার কথাই বলছে

আমাদের। বলছে, 'ঐ পোখু দেবতার মন্দিরই এখানকার সমাজ-জীবনের প্রাণকেন্দ্র। কাঠের মন্দির—স্তম্ভ ও দেওয়ালে সুন্দর সব খোদাই কাজ।'

'আপনি এত জানলেন কেমন করে শম্ভুদা, আপনি কি মন্দির দর্শন করেছেন?' সুশীল বিস্মিত।

'হ্যাঁ।' শম্ভু উত্তর দেয়। 'আমি গতকাল বাতে মোড়লের সঙ্গে গিয়েছিলাম মন্দিরে, সুশান্তদার লোকেশন দেখে এসেছি।' একবার একটু থেমে সে আবার বলতে থাকে, 'মন্দিরের সামনে একফালি উঠান। সেখানে একটা বেদির ওপরে নন্দীমূর্তি রয়েছে।

'উৎসবের সময় এই উঠানেই নাচ-গানের আসর বসে। প্রতিদিন দুপুরে পোখু দেবতার পুজো হয়। এ অঞ্চলে ব্রাহ্মণ নেই। এখানকার অধিবাসীরা খস রাজপুত। তাঁদেরই একটি পরিবার পুরুষানুক্রমে পোখু দেবতার পূজো করে আসছেন।'

শম্ভু থামতেই সুশীল প্রশ্ন করে, আচ্ছা শম্ভুদা, পোখু কি শিবের স্থানীয় নাম?'

'হঠাৎ এ প্রশ্ন?'

'না মানে মন্দিরের সামনে নন্দীমূর্তি রয়েছে কিনা।'

'আমার কিন্তু ধারণা, পোখু কোন দেব-দেবী নন, তিনি লৌকিক দেবতা। তবে নৈটয়ারবাসীরা মনে করে পোখু তাঁদের রক্ষক ও সংহারক। তিনি একদিকে যেমন অপদেবতাদের হাত থেকে তাঁদের রক্ষা করেন, আরেকদিকে তেমনি কোন পাপ বরদাস্ত করেন না। তাই তাঁরা পাপাচারী হতে সাহস পান না।'

'শুনেছি এঁদের প্রণাম-পদ্ধতিটি বিচিত্র?' শম্ভু থামতেই সুশান্তবাবু প্রশ্ন করেন।

'হ্যাঁ।'

'কি রকম?' সুশীল জিজ্ঞেস করে।

শম্ভু বলে, 'এঁরা পোখু দেবতাকে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে পেছন দিকে হাঁটতে হাঁটতে মন্দিরে প্রবেশ করেন। তারপর দু'দিক দিয়ে দু'খানি হাত পেছনে বাড়িয়ে দিয়ে পিঠের সঙ্গে ঠেকিয়ে করজোড়ে পোখুকে প্রণাম করেন অর্থাৎ প্রণামের সময় দেবদর্শনের সৌভাগ্য হয় না তাঁদের।'

'কে এই বিচিত্র নিয়মের প্রচলন করেছেন?'

'তা কেউ বলতে পারেন না। তবে শুনেছি, জনৈক পূজারী নাকি এই নিয়মের পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। তাই একদিন তিনি মন্দিরদ্বারে দাঁড়িয়ে পোখু দেবতাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে নিলেন। তারপরে সশ্রদ্ধ চিত্তে দেবদর্শন করে সামনের দিকে হেঁটে মন্দিরে প্রবেশ করলেন।'

'কি হল তাঁর?' সুশীল একনিশ্বাসে প্রশ্ন করে।

শম্ভু উত্তর দেয়, 'কেউ জানে না। তবে তারপরে সেই পূজারী নাকি আর মন্দির থেকে বেরিয়ে আসেন নি। নৈটয়ারের মানুষ আর কখনও দেখে নি সেই পূজারীকে।'

বিশ্রাম-ভবনে ফিরে এসে ব্রেক-ফাস্ট সেরে নিয়ে রওনা হতে সওয়া নটা বেজে গেল। খচ্চর ও কুলীরা আগেই রওনা হয়েছে। দেশাই, নির্মল এবং কামিকে নিয়ে দাহুও বেরিয়ে পড়েছে অনেকক্ষণ। তাকে যে 'হট্ লাঞ্চে'র ব্যবস্থা করতে হবে।

আজও পাসাং এবং দোরজি খচ্চরদের সঙ্গে গিয়েছে। তবে প্রাণেশ ও বিভাস আজ আর তাদের সহযাত্রী হয় নি। তারা আজ আমাদের সঙ্গী।

খচ্চর না থাকলেও কুকুরটা রয়েছে সহনেতার সঙ্গে। লালু যে কেন হঠাৎ বিভাসের এমন ভক্ত হয়ে উঠল বুঝতে পারছি না। মাত্র গতকাল সন্ধ্যায় ওদের দু'জনের প্রথম পরিচয় হয়েছে। কি জানি, হিমালয়ের কুকুর! হয়তো টের পেয়ে গেছে যে ডাক্তার ও পান্নাকে

নিয়ে অমূল্য না পৌঁছনো পর্যন্ত বিভাসই আমাদের নেতা।

কিন্তু লালুর মতলবটা কি? সে আর ক'দিন থাকবে আমাদের সঙ্গে? জারমোলা বিশ্রাম-ভবন থেকে সে আমাদের সঙ্গী হয়েছে। হিমালয়ের অধিকাংশ বিশ্রাম ভবনে এমনি দু'একটি কুকুর থাকে। তারা টুরিস্টদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করে। চলে যাবার সময় টুরিস্টদের খানিকটা দূর অবধি এগিয়েও দেয়। কিন্তু লালুর যে এখন পর্যন্ত চলে যাবার কোন লক্ষণ নেই।

বিশ্রাম-ভবন থেকে বেরিযে আমরা একটা সমতল ক্ষেতে নেমে এসেছিলাম। সেই ক্ষেত শেষ হয়ে গেল। এবারে একটা গাছে ছাওয়া পাহাড়ে উঠে এলাম। পাহাড়ের গা বেয়ে পথ। মাঝে মাঝে ঝরণা। কোনটি ছোট, কোনটি বড়। কোনটির ওপরে কাঠের পুল, কোনটি বা পায়ে হেঁটে পেরোতে হচ্ছে।

আমরা সারি বেঁধে পথ চলেছি। সবার আগে লালু। তারপরে বিভাস। আর সবার শেষে মণ্ডল, তার পেছনে বচন সিং। বলা বাহুল্য, মণ্ডল প্রজাপতি ধরতে ধরতে ধীরে-সুস্থে পথ চলেছে।

আমাদের কয়েকজন কুলি পথের পাশে মাল নামিয়ে রেখে মহাসুখে বিড়ি ফুঁকছে। প্রাণেশ তাদের পথ চলতে তাগিদ দেয়। বলে, 'এক মাইল এসেই বসে পড়লে! আজ যে বারো মাইল যেতে হবে রে ভাই!'

'একটা সিগ্রেট দে বেটা...এক সিগ্রেট...'

চমকে উঠি। থমকে দাঁড়াই। জনৈকা প্রৌঢ়া। পথের প্রান্তে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে আমার কাছে একটি সিগারেট চাইছেন। তাঁর পরনে কম্বলের পোষাক। হাতে ও গলায় ভারী রূপোর গয়না। পিঠে একটা পশমের বোঝা।

অবাক হই না। আমাদের দেশের মেয়েরাও তো অনেকে ধূমপান করেন। কেবল অশিক্ষিতা গ্রাম্য মহিলারা নন, সুশিক্ষিতা

শহুরে ভদ্রমহিলারাও হামেশা স্মোক করে থাকেন।

'কিন্তু বিপদ হচ্ছে, আমি নিজে সিগারেট খাই না। তবে ভরসার কথা আমার সহযাত্রীরা প্রায় সকলেই ও বস্তুটি পছন্দ করেন। তাদেরই একজনের কাছ থেকে একটি সিগারেট নিয়ে প্রৌঢ়ার হাতে দিই। খুশি হয়ে তিনি কি যেন বললেন আমাকে। বোধহয় আশীর্বাদ করলেন। মন্দ কি—পরের ধনে পোদ্দারী করা হল।

মহিলাটি সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়েন, কিন্তু পথ ছাড়েন না। পথ আগলে দাঁড়িয়ে তিনি ভাঙা-ভাঙা হিন্দীতে গল্প জুড়ে দিলেন। তাঁর সব কথা বুঝতে পারছি না। যতটুকু বুঝতে পারছি, তাতে মনে হচ্ছে তাঁর নাম ফল। সামনের ঐ পাহাড়টার ওপাশে ছোট একটা অধিত্যকা আছে, সেখানেই তাঁর ঘর। ঘরে তাঁর ছেলে-মেয়ে এবং স্বামী আছেন। একফালি ক্ষেত ও কয়েকটা ভেড়া আছে তাঁদের। সেই ভেড়ার পশম নিয়েই তিনি টনটয়ার চলেছেন—বিনিময়ে নমক এবং মিটী কা তেল নিয়ে আসবেন।

এ অঞ্চলে এখনও বিনিময়-প্রথার প্রচলন রয়েছে। এরা জিনিসের বদলে জিনিস চায়। এমনকি শ্রমের পরিবর্তেও জিনিস পেলে খুশি হয়। টাকা দিয়ে কি করবে এরা। টাকা দিয়ে জিনিস কিনতে হলে তো সেই নিচে যেতে হবে। জিনিস বলতে অবশ্য প্রধানত তিনটি—কেরোসিন, চিনি ও নুন। তবে দেশলাই, জুতো এবং একটু সরষের তেল পেলেও খুশি হয়। আর কিছু বড় একটা দরকার হয় না এদের। তমসা উপত্যকা বেশ উর্বরা। ক্ষেতে যা খাবার হয় তাতেই চলে যায় কোনমতে। পোষাকও এরা ঘরে তৈরি করে নেয়। ভেড়ার লোমের কম্বল বুনে প্যান্ট-কোট বানায়।

প্রৌঢ়া একটি সু-খবর জানান আমাদের। বলেন, 'আরেকটা

জিনিসও আমরা ঘরেই তৈরী করে নিই।'

'কি?'

'দারু···সরাব।'

মহিলাটি চলে গিয়েছেন আপন পথে, আমরা এগিয়ে চলেছি আমাদের পথে। তমসার তীরভূমি দিয়ে পথ। তমসা আজ অবশ্য মাঝে মাঝে দৃষ্টির বাইরে চলে যাচ্ছে। কিন্তু তার শব্দ শুনতে পাচ্ছি সব সময়।

চড়াই পথ বেয়ে সংকীর্ণ একটি গিরিখাতের ওপরে উঠে এলাম। এখন বেলা সাড়ে দশটা। সোয়া ঘণ্টায় আমরা মাত্র দু' মাইল এসেছি। এত আস্তে হাঁটলে চলবে না। তালুকা এখনও দশ মাইল।

মুশকিল হয়েছে মণ্ডলকে নিয়ে। সে বোধহয় বহু পেছনে। থাক্ গে, তার সঙ্গে বচন রয়েছে। আমরা তাড়াতাড়ি নেমে আসি সেই ক্ষুদে গিরিখাত থেকে।

কিছুদূর এসে কয়েকজন পথচারীর সঙ্গে দেখা হল। পথ-চারীদের সংখ্যা বড়ই কম এপথে। তবে আনন্দের কথা, তাদের অধিকাংশ যুবতী—সুন্দরী যুবতী।

ওরা চলে গেল। আমরাও এগিয়ে চলি।

সামনের দিকে তাকাতেই দেখতে পেলাম তাকে—তুষারাবৃত হিমালয়কে। মুহূর্তে সকল পথশ্রম দূর হয়ে গেল। আমার দেহ ও মন জুড়িয়ে এল।

কতদিন পরে আবার দেখা হল। গতবছর আমার আসা হয় নি হিমালয়ে। প্রায় দু'বছর বাদে আজ দেখা হল হিমতীর্থ-হিমালয়ের সঙ্গে। আমি তাই প্রাণভরে দেখে নিই তাকে। এ দেখার শেষ নেই। তাহলেও একসময় পথ চলা শুরু করতে হয়।

যতদূর মনে হচ্ছে সামনের তুষারধবল শৃঙ্গটিই স্বর্গারোহিণী।

২০,৫২১ ফুট উঁচু ঐ শৃঙ্গটিকে স্থানীয়রা বলেন—সুগ্‌নালিন। আর প্রখ্যাত পর্বতারোহী হিমালয়-প্রেমিক জে. টি. এম. গিব্‌সন বলেছেন—

'Sugnalin is a corruption of Swargarohini, meaning "The Path to Heaven"—a fine name for a fine mountain.'

আমরা তার কাছেই চলেছি। তমসা যে তারই তুষারবিগলিত বৈতরণী। তাছাড়া স্বর্গারোহিনী যে হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকছে আমাদের। আমরা জোর কদমে এগিয়ে চলি।

কিন্তু চলতে চাইলেই কি চলার উপায় আছে? কুলিরা আজ বড়ই গোলমাল করছে। কয়েকজন কুলি পথের পাশে মাল নামিয়ে রেখে তাস খেলতে শুরু করেছে। প্রাণেশ অনেক বলে-কয়ে তাদের পথ-চলা শুরু করায়।

আজ কুলিদের বারে বারে এত বিশ্রাম নেবার কোন কারণ নেই। আজকের পথ মোটেই দুর্গম নয়।

নৈটয়ার থেকে মাইলচারেক এসে মৌটার—ছোট গ্রাম। খানপঁচিশেক ঘর আর শ'দেড়েক মানুষ নিয়ে গ্রাম। পথের ধারে একটি মাত্র চায়ের দোকান। আমরা সেই দোকানের দাওয়ায় এসে বসি। একে তো মণ্ডল পেছিয়ে পড়ছে, তার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা উচিত, তার ওপরে আড়াই ঘণ্টা ধরে একটানা হাঁটছি। এখন একগ্লাস গরম চা পেলে ভালই হয়।

চা শেষ করার আগেই কুলিরা এসে ঘেরাও করল—ওরাও চা খাবে। একযাত্রায় পৃথক ফল হওয়া উচিত নয়। সুতরাং দোকানীকে আবার চা বানাতে বলি।

মণ্ডলের পাত্তা নেই। আর কতক্ষণ বসে থাকব? ক্ষিদে পেয়ে গেছে। শুধু চা-য়ে কি পোড়া পেটের জ্বালা মেটে।

পণ্ডিত তাগিদ দেয়, 'চলুন তো এবারে রওনা হওয়া যাক। আপনি বাঁচলে বাপের নাম। দেখলেন না, বিভাস লালুকে নিয়ে কেমন গট মট করে এগিয়ে গেল।'

অতএব আমরাও এগিয়ে চলি। মণ্ডলের জন্য চিন্তার কি আছে? ওর সঙ্গে বচন সিং রয়েছে।

কয়েক পা এগিয়েই জনৈক গ্রামবাসীর সঙ্গে আলাপ হয়। সে জানায় - মৌটার ছোট গ্রাম হলেও, সামনের ঐ পাহাড়টার ওপারে কোটগাঁও নামে বেশ বড় একটি গ্রাম আছে। প্রায় সাড়ে তিনশো লোকের বাস। শ'দুয়েক একর জমি আর গুটি ষাটেক ঘর নিয়ে গ্রাম। লোকটি সেই গ্রামেই চলেছে। সামনের ঐ পাহাড়ী নদীটা পেরিয়ে সে ডানদিকের চড়াই পথ ধরবে, আর আমরা বাঁ দিকের প্রায় সমতল পথে এগিয়ে যাব তালুকার দিকে।

॥ তিন ॥

ঘুম ভেঙে যায়। কেউ আমার গা টিপে দিচ্ছে।

কে আবার! নিশ্চয়ই সুশীল। সে খুব ভাল ম্যাসাজ করতে পারে। সকালে কারও ঘুম ভাঙাবার দরকার হলেই সে বিনা নোটিসে তাকে ম্যাসাজ করতে আরম্ভ করে দেয়। ঘুম ভেঙে যায়, কিন্তু কেউ বিরক্ত হয় না। ম্যাসাজ বস্তুটি ঘুমের চাইতে বেশি আরামদায়ক। সুতরাং সুশীলের এই দলাই-মলাই ঘুমন্ত-মানুষকে বিছানা ছাড়াবার চমৎকার দাওয়াই।

কয়েক মিনিট ম্যাসাজ করবার পরেই সে আসল কথাটি বলে, 'শঙ্কুদা, সাতটা বাজে! বিভাসদা বলেছেন, আটটায় মার্চ।'

অতএব আর শুয়ে থাকা উচিত হবে না। অনেক কাজ বাকি —হাত-মুখ ধোওয়া, এয়ার-ম্যাট্রেসের হাওয়া ছেড়ে বিছানা তোলা, পোষাক পরা, রুক্‌স্যাক গুছিয়ে নিয়ে ব্রেক-ফাস্ট করা…।

তাড়াতাড়ি উঠে বসি।

দিলীপ ছাড়া আর সবাই বিছানা ছেড়েছে দেখতে পাচ্ছি। সত্যি লজ্জার ব্যাপার। হিমালয়ে এসে সবাইকে সকাল সকাল শয্যা ছাড়তে হয়। তাছাড়া কলকাতায়ও আমি এত বেলা অবধি ঘুমিয়ে থাকি না।

আজও থাকতাম না। শেরপা পাচক কামি যখন ছ'টার সময় বেড-টি নিয়ে এল, তখন যথারীতি ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু বেড-টি শেষ করে আবার শ্লীপিং ব্যাগের জিপ-টা টেনে দিয়েছিলাম। ভেবেছি একটু গড়াগড়ি দিয়ে উঠে পড়ব। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠে নি। আমি আবার ঘুমিয়ে পড়েছি।

সুশীল বলে, আমি তাহলে মণ্ডলদাকে একটু ম্যাসাজ করে দিই।'

অর্থাৎ সে এবারে শেষ ঘুমন্ত সদস্যটির ঘুম ভাঙাবে। আমি মাথা নাড়ি।

সুশীল মণ্ডলকে আক্রমণ করে। আর মণ্ডল আর্তকণ্ঠে চেঁচাতে থাকে, 'সুশীল, ভাই! একটু আস্তে। তুমি তো জানো, আমি চর্ম-সর্বস্ব। আমার গায়ে মাংস-টাংস কিছু নেই—হাড়ের ওপর স্রেফ্ একপোঁচ চামড়া।…'

রুকস্যাক থেকে দাঁতের মাজন নিয়ে বাথরুমে ঢুকি। এখনও ঠাণ্ডাজল মুখে দেওয়া যাচ্ছে, দাঁত মাজতে পারছি। কিন্তু—কয়েকদিনের মধ্যেই এ-সব পাট চুকিয়ে দিতে হবে। পাঠক-পাঠিকারা নোংরা ভাবলেও আমরা নিরুপায়। উচ্চ-হিমালয়ে ঠাণ্ডা জল মুখে দেওয়া আর বিষপান করা একই কথা।

দুখানি বড় ও একখানি মাঝারী বেড়রুম এবং একটি বারান্দা ও দুটি বাথরুম নিয়ে তালুকা বিশ্রামগৃহ। উচ্চতা বেশি নয়—মাত্র ৬৫০০´। কিন্তু স্থায়ী তুষার-রেখার কাছে বলেই এত শীত।

বাতে ঘরের ভেতরেও আমাদের শ্লীপিং-ব্যাগে ঢুকতে হয়েছিল। শেরপারা অবশ্য কুলিদের সঙ্গে বাইরের খোলা বারান্দায় শুয়েছে। ওদের নাকি ঘরে গরম লাগত।

প্রাতঃকৃত্য সেরে ঘরে আসি। না, সুশীলকে বাহাদুর বলতে হবে। সে মণ্ডলকে শ্লীপিং-ব্যাগ ছাড়িয়েছে।

পোশাক পরে বেরিয়ে আসি বারান্দায়। কুলিদের রান্না-খাওয়া শেষ। তারা রওনা হবার মুখে। শেরপা পাসাং ও দোরজি তাদের মালপত্র ঠিক করে দিচ্ছে। প্রাণেশ ও বিভাস তদারকি করছে।

তালুকা ঠিক কোন গ্রাম নয়। এটি বন-বিভাগের একটি কর্মকেন্দ্র।

গুটি কয়েক ঘর আর ৩০।৪০ জন মানুষ নিয়ে জনপদ। দোকান পাট কিছুই নেই। ক্ষেত বলতেও এই বিশ্রামগৃহের চারিপাশের সামান্য সমতলটুকু।

গতকাল বিকেল সাড়ে ছ'টায় আমরা তালুকা পৌঁছেছি। হিমালয় বলেই বিকেল বলছি, নইলে সেপ্টেম্বরের শেষ, কলকাতায় তখন রীতিমত রাত। এখানে দিনের আলো ছিল।

সেই সোনালী আলোতেই আমার তালুকার সঙ্গে শুভদৃষ্টি হল। আমি মুগ্ধ আবেশে দেখলাম তাকে। দেখলাম এই বিশ্রামগৃহটি আর চারিদিক বনময় পাহাড়ে ঘেরা অপ্রশস্ত উপত্যকাটিকে। ছোট হলেও ভারী সুন্দর। তমসা এখানে অর্ধচন্দ্রাকারে একটি বাঁক নিয়েছে। তার দু-তীরেই সাদা পাথরের সমতল বেলাভূমি।

ভাগ্যবানরা কিন্তু বহু বছর থেকে জীপ গাড়িতে করে তালুকা পর্যন্ত আসা-যাওয়া করতেন। কিছুদিন আগেও পুরোলা ও তিউনি থেকে এ পর্যন্ত একটি জীপ-পথ ছিল, এখন নেই। সেই জীপ-

পথটিকে প্রসারিত করেই বাস-পথ তৈরি হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে বাস চলবে তালুকা পর্যন্ত। তখন আর যাত্রীদের পুরৌলা' থেকে এই ৩২ মাইল পথ হাঁটতে হবে না। তাঁরা এখান থেকে মাত্র ১৪ মাইল পদচারণার পরেই পৌছতে পারবেন রূপতীর্থ হরকিদুন।

তাহলেও ভাবীকালের যাত্রীদের জন্য বেদনা বোধ করছি। তমসা উপত্যকার অপরূপ রূপের অনেকখানিই যে তাঁদের অদেখা রয়ে যাবে।

গতকাল রাতটি আমাদের মন্দ কাটে নি। কেবল দিলীপ কুমারের হ্যাভারস্যাক থেকে উদ্ভট সব ওষুধের গন্ধে ঘুমোতে একটু দেরি হয়েছে। প্রজাপতি ও কীটপতঙ্গ নিধন এবং সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন ধরণের সব ওষুধ আছে দিলীপের হ্যাভারস্যাকে। অত্যন্ত উগ্র ও উদ্ভট সেগুলির গন্ধ। কিন্তু দিলীপকুমার কিছুতেই ঐ থলেটিকে কাছ-ছাড়া করবে না। মাথার কাছে রেখে ঘুমোবে। বলাই বাহুল্য, তাতে ওর কোন অসুবিধে হয় না—পরমপ্রিয় গন্ধটি শুঁকতে শুঁকতে সুনিদ্রার কোলে ঢলে পড়ে।

ব্রেক-ফাস্ট সেরে সকাল ঠিক সওয়া আটটায় পথে বেরিয়ে পড়লাম। আজ আমরা তমসা উপত্যকার শেষ গ্রাম ওসলা যাচ্ছি। দূরত্ব বেশি নয়, ৮ মাইল। কিন্তু আজ আর জীপ-চলাচলের প্রশস্ত পথ নয়—পাহাড়ী গাঁয়ের পায়ে-চলা পথ। তাই সকাল-সকাল বেরিয়ে পড়তে হল।

বিশ্রামগৃহ থেকে উৎরাই পথ বেয়ে নেমে এলাম তমসার তীরে। নৈটয়ার ছাড়াবার পরে তমসাকে আর এত কাছে পাই নি। বাঁয়ে নীল তমসা, ডাইনে সবুজ পাহাড়, আর সামনে শুভ্রা স্বর্গারোহিণী। আমরা পুলকিত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছি।

কিছুক্ষণ বাদেই ক্ষেত শেষ হয়ে গেল, শুরু হল চড়াই। আমরা ডানদিকের পাহাড়ে উঠে এলাম। গাছে ছাওয়া পাহাড়, ছায়া

ঘেরা পথ আর রোদে ভরা তমসা। আলো ছায়ার সানন্দ সহাবস্থান।

দাদু তার দল বল অর্থাৎ রান্নাব লোকজন নিয়ে এগিয়ে গিয়েছে। যেতেই হবে। দাদু অর্থাৎ বঙ্কিম মল্লিক যে অভিযানেব কোয়ার্টাব মাস্টাব। বয়সের হিসেবে আমাদের দলে তার স্থান সুশান্তবাবুর পরেই। কিন্তু উৎসাহের বিচারে সে সবচেয়ে তরুণ। রাতে সবার শেষে ঘুমোতে যায়, সকালে সবার আগে ঘুম থেকে ওঠে। এবং প্রতিদিন প্রথম গন্তব্যস্থলে পৌঁছয়। দাদু এগিয়ে গিয়েছে, আজও পথেব মাঝে হট্‌লাঞ্চের ব্যবস্থা হয়েছে।

আজ বিভাস ও মামা দাদুর সঙ্গে গিয়েছে। ওবা সকলেই অভিজ্ঞ পর্বতাবোহী। দূতাগারেব সফলকাম যোগীন—২ (২০,৮০৫´) অভিযানের সদস্য ছিল। মামার পুরো নাম জগন্নাথ দত্ত। সে বিভাসের মামা বলে সবাই তাকে মামা ডাকে। সে আমাদের অভিযানের ফটোগ্রাফাব।

দেশাই ও নির্মল আজ আমাদেব সঙ্গী হয়েছে। ওরা দুজনেই এই প্রথম পর্বতারোহণে এসেছে, কিন্তু দুজনেরই হিমালয়ের পদ-যাত্রা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা রয়েছে। দেশাই বম্বের ছেলে, আর নির্মল বেহালা পর্ণশ্রী পল্লীর বাসিন্দা। প্রথমদিন থেকেই দেখছি নির্মল একজন উৎসাহী ও কর্মঠ যুবক। এক'দিন দাদুকে সে খুবই সাহায্য করেছে। তবে লক্ষ্য করেছি, মাঝে মাঝেই সে কেমন যেন আনমনা হয়ে যায়। প্রথম প্রথম তার এই আকস্মিক পরিবর্তনে বিস্মিত হতাম। পরে কারণটা জানতে পেরে বিস্ময় কেটে গিয়েছে। নির্মল মাত্র ক'দিন আগে বিয়ে করেছে। বিয়ের পরে বউ নিয়ে হানিমুনে না গিয়ে, বউকে ফেলে বিপদসঙ্কুল পর্বতাভিযানে আসার নজির খুব বেশী নেই। সুতরাং নির্মল সেনের মাঝে মাঝে অমন আনমনা হয়ে যাবার অধিকার অবশ্যই

আছে।

আঁকাবাঁকা উঁচু-নিচু বনময় ছায়াপথ বেয়ে এগিয়ে চলেছি। একটা কাঠের পুলের ওপরে উঠে এলাম। পুলের তলা দিয়ে পাহাড়ী ঝরনা দুর্বার বেগে বয়ে যাচ্ছে। যাচ্ছে তমসার অনন্ত-ধারায় নিজেকে নিঃশেষ করে দিতে।

আগেই বলেছি আজ আমাদের যাত্রাপথের দূরত্ব কম। খুব একটা চড়াই-পথও নয়। আট মাইলে মাত্র উনিশশো ফুট উঠতে হবে—৬৫০০ ফুট থেকে ৮৪০০ ফুটে। এটি অবশ্যই ওসলা বিশ্রামগৃহের উচ্চতা। গ্রামটা আরও শ'পাঁচেক ফুট ওপরে অবস্থিত।

পুল পেরিয়েই একফালি দূর্বা-ছাওয়া প্রায়-সমতল প্রান্তর। পণ্ডিত ও প্রাণেশের সঙ্গে বসে পড়ি সেখানে। দেশাই, নির্মল ও সুশীল ঝরণার তীরে পাথর কুড়োতে লেগে যায়। ভারী সুন্দর সুন্দর পাথর পড়ে রয়েছে ওখানে—যেমন মসৃণ, তেমনি রঙিন।

তবু ওদের কাণ্ড দেখে হাসি পাচ্ছে আমার। আমরা চলেছি দূর-দুর্গম হিমালয়ে। সেখানে নিজেদের একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ বইতেই প্রায় প্রাণান্ত। বাধ্য হয়ে একদিন রুকস্যাকের ওজন হালকা করতে ওদের এই সব পাথর ফেলে দিতে হবে। এত সাধের পাথর সেদিন ঠাঁই পাবে কোন প্রস্তরময় গ্রাবরেখা কিংবা তুষারাবৃত হিমবাহে।

তাহলেও বাধা দিই না এই অনভিজ্ঞ অভিযাত্রীদের। ভাবি ওরা যদি কোনমতে এর একটুকরো পাথরও নিয়ে যেতে পারে, তবে সেটি যে ওদের ভবিষ্যতের অক্ষয় স্মৃতি হয়ে রইবে।

কিছুক্ষণ বাদেই দিলীপকুমার খোঁড়াতে খোঁড়াতে হাজির হয়। এসেই ধপ্ করে বসে পড়ে পণ্ডিতের পাশে। তারপরে একটু দম নিয়ে করুণ কণ্ঠে বলে, 'ভাই পণ্ডিত, আমি জানত তোমার

কোন ক্ষতি করি নি। তাহলে কেন তুমি আমাকে এই বিপদে ফেললে ?'

'কেন কি হল আবার ?' সহাস্যে প্রশ্ন করি।

'কি হতে আর বাকি রইল দাদা ?' মণ্ডল পাল্টা প্রশ্ন করে। বলে, 'সত্যি বলছি শঙ্কুদা, আমি আর পারছি না। পায়ের ফোস্কাগুলো গলে গিয়ে ঘায়ের মত হয়ে গিয়েছে।'

'জুতো খুলে ফেল তো, দেখি কি হয়েছে ?' পণ্ডিত গম্ভীর স্বরে মণ্ডলকে বলে।

'দেখো, তোমাকে আমি একেবারে বিশ্বাস করি না। তোমার জন্যই আজ আমার এই অবস্থা।' একবার থামে মণ্ডল। তারপরে অপেক্ষাকৃত শান্তস্বরে বলে, 'তবে বলছ যখন, জুতো খুলছি। কিন্তু সাবধান, কোন ডাক্তারী করতে যেও না যেন।'

পণ্ডিত কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডাক্তারী করে। সে তার রুক্‌স্যাক্ থেকে ফার্স্ট-এইড্ বক্স নামায়। মণ্ডলের গলে যাওয়া ফোস্কার পাতলা চামড়া কেটে ফেলে দেয়। তারপরে তার পায়ে ওষুধ দিয়ে 'লিউকোপ্লাস্ট' লাগায়।

মণ্ডল জুতো পরে, কয়েক পা হাঁটে। খুশি স্বরে বলে, 'থ্যাঙ্ক ইউ পণ্ডিত। তুমি তোমার পাপের খানিকটা প্রায়শ্চিত্ত করলে।'

'অকৃতজ্ঞ কোথাকার !'

আমরা পণ্ডিতের মন্তব্যে হেসে উঠি। কিন্তু মণ্ডল সে মন্তব্যকে মোটেই মূল্য দেয় না, সে হ্যাভারস্যাক্ পিঠে তুলে আইস-অ্যাক্‌স হাতে নেয়। পাকা পর্বতারোহীর ভঙ্গিতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁক ছাড়ে, 'বচন।'

'জী সাব্ !'

'কালেকশন করেগা।'

'ঠিক হ্যায় সাব্।' বচন নিজের রুক্‌স্যাকের গা থেকে

প্রজাপতি ধরার জালটি খুলে মণ্ডলের হাতে দেয়। জাল হাতে পেয়েই দিলীপকুমার প্রজাপতির পেছনে ছুটতে থাকে। সে যে ভারত সরকারের একজন কর্তব্যপরায়ণ অফিসার।

আমরা এগিয়ে চলি। গত তিনদিন আমি সাধারণত মণ্ডলের সঙ্গে পথ চলেছি। কিন্তু আজ আর অত আস্তে হাঁটতে ইচ্ছে করছে না। আর তার দরকারই বা কি? বচন সিংই তো রয়েছে ওর সঙ্গে। ওদের পেছনেই কুলিরা আসছে।

পথ রুদ্ধ। ধস নেমেছে পাশের পাহাড় থেকে। পথের অনেকখানি অংশ তার শিকার হয়েছে—তমসায় আশ্রয় নিয়েছে।

কিন্তু মানুষ যে পথিকৃৎ। তারা দূর-দুর্গমের বুকেও পথ তৈরি করে নিয়েছে। সংকীর্ণ পায়ে-চলা পথ। তবে দুর্গম এবং শ্রমসাপেক্ষ।

সেই পথের গোড়াতেই দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা—জগন্নাথ, বিভাস ও বঙ্কিমবাবু, মামা, ভাগনে ও দাদু। কর্তব্যপরায়ণ পর্বতারোহীরা সহযাত্রীদের নিরাপত্তার প্রয়োজনে দুর্গম পথের পাশে প্রতীক্ষারত।

কাছে আসতেই বিভাস বলে, 'কয়েক মিনিট বিশ্রাম করে একটু পাইন-অ্যাপ্‌ল জুস খেয়ে নিন। চড়াইটা বেশ কঠিন।'

সহনেতার নির্দেশ পালন করি; ফলের রসের টিনটা হাতে নিয়ে খানিকটা রস গলায় ঢেলে দিই। আনারসের রস তো নয়, অমৃতবারি—সকল শ্রান্তি দূর হয়ে গেল।

কিন্তু রওনা হতে পারি না। দিলীপের দেখা নেই। এখানে পথের যা অবস্থা, তাতে একা বচনের ভরসায় তাকে ফেলে যাওয়া উচিত হবে না।

আধঘণ্টা কেটে যায় দিলীপ আসে না, আসে সেভীরাম—আমাদের মেট, অর্থাৎ কুলির সর্দার। সে অভিজ্ঞ ও কুশলী পর্বতারোহী। সুতরাং তাকে এখানে রেখে আমরা অনায়াসে

এগিয়ে যেতে পারি।

তাই করে বিভাস। সেতীরামের হাতে অবশিষ্ট ফলের রসটুকু দিয়ে বলে, 'মণ্ডলসাব্ এলে তাকে এটুকু খাইয়ে খুব সাবধানে নিয়ে যাবি। সব সময় তার পেছনে থাকবি।'

'ঠিক হ্যায় সাব্!' সেতী মাথা নাড়ে।

'কেয়া ঠিক হ্যায়?'

'বিলকুল।'

'তোম্ ব্লাডি ফুল্।'

'জী, ঠিক হ্যায় সাব।'

আমরা হাসতে হাসতে চড়াই ভাঙতে শুরু করি। অনুগত প্রহরীর মত সেতীরাম সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে।

বেলা ঠিক বারোটার সময় আমরা মধ্যাহ্ন-ভোজনস্থলে উপস্থিত হলাম। একফালি সবুজ সমতলের বুক চিরে বয়ে যাচ্ছে একটি ঝরণা। তারই তীরে আমাদের শেরপা পাচক কামির অস্থায়ী রসুইখানা। তাড়াতাড়ি বসে পড়ি।

খাওয়া শেষ হয়েছে, কিন্তু পথ-চলা শুরু করা যাচ্ছে না। মণ্ডল যে এখনও এসে পৌঁছল না দুশ্চিন্তার কিছু নেই। সেতীকে সেখানে রেখে এসেছি। দরকার হলে সে দিলীপকুমারকে কাঁধে করে নিয়ে আসতে পারবে।

তবু আমরা দিলীপের জন্য দেরি করছি। সত্যি বলতে কি, সে সঙ্গে না থাকলে পথ-চলাটাই কেমন পানসে হয়ে ওঠে। তার মতো সঙ্গী পাওয়া যে-কোন পদযাত্রীর পরম সৌভাগ্য।

না, দিলীপকুমারের সঙ্গলাভের প্রত্যাশায় আর বসে থাকা সম্ভব হল না। কামির সহকারী জয়বাহাদুরের কাছে দিলীপ. বচন ও সেতীর খাবার রেখে আমরা এগিয়ে চলি ওসলার পথে।

॥ চার ॥

গতকাল বেলা তিনটে নাগাদ আমরা ওসলা বন-বিশ্রামগৃহে পৌঁচেছি। পথের ডানদিকে বিশ্রামগৃহ। সামনে টিনের পরিচয়পত্র—

'বন-বিশ্রামগৃহ, ওসলা। উচ্চতা ৮৪০০´।

হরকিদুন—৬ মাইল। তালুকা—৮ মাইল।'

পাশে আরেকটি সাইনবোর্ড—

'Game Sanctuary, গোবিন্দ পশু বিহার।' অর্থাৎ এটি সংরক্ষিত বনাঞ্চল। এখানে শিকার নিষিদ্ধ।

বিশ্রামগৃহেব ঠিক বিপরীতদিকে তমসার ওপারে খানিকটা উঁচুতে ওসলা গ্রাম—উপত্যকার শেষ জনপদ। জনসংখ্যার বিচারে ওসলা তমসা উপত্যকার চতুর্থ বৃহত্তম গ্রাম। প্রায় পঞ্চান্নখানি ঘর ও দেড়শো একর জমি নিয়ে গ্রাম। শ' তিনেক মানুষের বাস। বিশ্রামগৃহ থেকে গ্রামটিকে অবিকল একখানি রঙিন ছবি বলে মনে হচ্ছে।

এপারে ঘন-বনময় পাহাড়। কিন্তু ওপারে বড় গাছপালা দেখছি না। তবে গাঁয়ের চারিদিকেই ক্ষেত রয়েছে। বিশ্রামগৃহ থেকে খানিকটা এগিয়ে গেলেই পুল পাওয়া যাবে। একটি নয়, দুটি পুল। বেশ পুরনো। হরকিদুনের প্রকৃত আবিষ্কারক প্রখ্যাত পর্বতারোহী জে. টি. এম গিবসন যখন ১৯৪৮ সালে প্রথম এখানে আসেন, তখনও তিনি দুটি পুলই দেখেছেন।

পুল পেরিয়ে চড়াইপথে মাইলখানেক এগিয়ে গ্রাম—ওসলা গ্রাম। কম করে আরও শ' পাঁচেক ফুট উঠতে হবে। অর্থাৎ গ্রামের উচ্চতা ন' হাজার ফুটের মতো। কাল বিশ্রামগৃহের আঙিনায় বসে আমরা গ্রামটিকে দেখছিলাম বারে বারে। আজও তাই দেখছি। বড় ভাল লাগছে দেখতে।

তালুকার থেকেও ছোট এই বিশ্রামগৃহ। তবে আমাদের কোন অসুবিধে হচ্ছে না। সামনে সুপ্রশস্ত বারান্দা। ভেতরে পাশাপাশি দু'খানা বড় ঘর। ফায়ারপ্লেস এবং লাগোয়া বাথরুম রয়েছে। পেছনের বারান্দাটি ঘেরা—ঘর হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

একটু নিচে রান্নাঘর এবং বাবুর্চিদের বাসগৃহ। কাল সেখানে শেরপারা ও কয়েকজন কুলি বাসা বেঁধেছিল, বাকি কুলিরা রাত কাটিয়েছে বিশ্রামগৃহের বারান্দায়—মালপত্রের সঙ্গে।

গতকাল আমরা ওসলা পৌঁছবার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে খচ্চর এসে গিয়েছে, কুলিরা মালপত্র নিয়ে আসতে শুরু করেছে। তবু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারি নি। কারণ তখনও মণ্ডলের পাত্তা পাওয়া যায় নি। কুলীদের কারও সঙ্গে দেখা হয় নি তার। অথচ তারা বলেছে সেতী ও জয়বাহাদুর যথাস্থানে অপেক্ষা করছে।

প্রাণেশ ও বিভাস কিন্তু কাল আমাদের সে দুশ্চিন্তার অংশীদার হয় নি। ওরা পাকা পর্বতারোহী বেশি ভয় ভাবনা থাকলে পর্বতারোহী হওয়া যায় না। আমার প্রশ্নের উত্তরে বিভাস শুধু বলেছিল—মিথ্যে মন খারাপ করবেন না, মণ্ডল ঠিক এসে যাবে।

ওরা দুজনে তখন বসে বসে আজকের কর্মসূচী ঠিক করছিল। শেষ পর্যন্ত সাব্যস্ত করল—আজ সকালে ব্রেক-ফাস্ট করে প্যাকড-লাঞ্চ নিয়ে ওরা এগিয়ে যাবে আমাদের গন্তব্যস্থল ধুমধার-কান্দি গিরিবর্ত্মের দিকে। ওদের সঙ্গে যাবে সুশীল, নির্মল, দেশাই, শেরপা পাসাং ও দোরজি এবং কুলি তুলবাহাদুর। এ পথের অনেকখানি তার চেনা। সে গতবছর ( ১৯৭১ ) সফলকাম ব্ল্যাক্ পিক্ ( বান্দরপুঁছের কৃষ্ণচূড়া ) অভিযাত্রীদের সঙ্গে ছিল।

ঠিক হল প্রাণেশ ও বিভাস তিরিশজন কুলি নিয়ে তালাও পর্যন্ত অগ্রসর হবে, সেখানে শিবির স্থাপন করে কুলিদের ছেড়ে

দেবে। তারা ওসলা ফিরে আসবে। ইতিমধ্যে অমূল্যরা এসে যাবে। আমরা বাকি মাল নিয়ে তালাও শিবিরে চলে যাব। এই তিন চারদিন বিভাসরা ধুমধার-কান্দির পথ খুঁজবে। আব আমি এই অবসরে হরকিদুন দর্শন করে আসব।

তালাও মানে হ্রদ। কৃষ্ণচূড়ার (২০,৯৫৬´, পাদদেশে সাড়ে এগারো হাজার ফুট উঁচুতে প্রায় সমতল তৃণাচ্ছাদিত সুবিশাল প্রান্তর। তারই একাংশ জুড়ে চমৎকার একটি হ্রদ রয়েছে। সেখানেই শিবির করবে ওরা।

ওসলা তমসা উপত্যকার শেষ জনপদ। বান্দরপুঁছ পর্বতমালাব করুণাধারা রুঁইসারা গাড় ও স্বর্গারোহিণী শৃঙ্গমালার অমৃতধারা হরকিদুন নালার মিলনভূমি ওসলা। ঐ দুটি নদীর মিলিতধারাই তমসা। এই বিশ্রামগৃহ থেকে খানিকটা এগিয়ে গেলেই সেই সঙ্গম দর্শন করা যায়। সুতরাং ওসলা তমসার জন্মভূমি. এবং এখানেই তমসার তীরে তীরে পথচলা শেষ হল আমাদের।

বিভাস তার দলবল নিয়ে একটু বাদেই যাত্রা করবে ধুমধার-কান্দির দিকে -তালাও-য়ের পথে। ওরা যাবে রুইসাবা গাড়ের তীর দিয়ে দক্ষিণ-পূর্বে। আর আমি, শম্ভু ও মণ্ডল আগামীকাল সকালে রওনা হব রূপতীর্থ হরকিদুন। আমাদের পথ হরকিদুন নালার তীর ধরে উত্তর-পুবে। এই দুই নদীর মাঝখানেই স্বর্গারোহিণী শৃঙ্গমালা।

কিন্তু আজ কিংবা আগামীকালের কথা থাক গতকালেব কথা বলে নিই। গতকাল বিকেল পাঁচটা নাগাদ জয়বাহাদুর এখানে চলে এলো। বিস্মিত হলাম, মণ্ডল আসে নি। তাকে জিজ্ঞেস করলাম—মণ্ডলসাব কিধর?

—নহী জানতা। তার কণ্ঠস্বরে রীতিমত বিরক্তি প্রকাশ পেয়েছে। পাবারই কথা। মণ্ডলের খাবার নিয়ে বেচারা বহুক্ষণ একা

একা বসেছিল সেই জনহীন প্রান্তরে। কিন্তু মণ্ডল আসে নি।

গেল কোথায়? দুঘণ্টা আগে আমরা ওসলা পৌঁচেছি। অতক্ষণ তো দেরি হবার কথা নয়। সুতরাং দুশ্চিন্তায় পড়েছি।

কিন্তু তারপরেই মনে পড়েছে কথাটা—সেতীরামকেও তো রেখে আসা হয়েছে। সে শুধু কুলির মেট নয়, একজন সুদক্ষ পর্বতারোহী। সুতরাং দুশ্চিন্তা অর্থহীন। বরং দুঃখ হয়েছে সেতীর কথা ভেবে। মণ্ডলের জন্য তাকেও অভুক্ত থাকতে হল। ওরা না আসায় জয়বাহাদুর ওদের খাবার কুলিদের দিয়ে ওসলা চলে এসেছে।

শেষ পর্যন্ত মণ্ডল ওসলা পৌঁছল। তখন সন্ধ্যার সামান্যই বাকি। আমাদের সোচ্চার অভিনন্দনের মাঝে অভিযাত্রী দিলীপ-কুমার খোঁড়াতে খোঁড়াতে বিশ্রামগৃহে উঠে আসে। পিঠ থেকে হ্যাভারস্যাক খুলে নিতেই সে সটান শুয়ে পড়ে একখানি খাটিয়ায়। প্রাণেশ তাড়াতাড়ি জুতো খুলে দেয়। দাদু কফি, বিস্কুট ও বাদাম নিয়ে আসে।

কিছুক্ষণ বাদে মণ্ডল একটু প্রকৃতিস্থ হয়। কিন্তু তাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারার আগেই সে পাশের ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

বাধ্য হয়ে বচনকে সেতীর কথা জিজ্ঞেস করতে হয়। বচন বিস্মিত হয়। বলে—সেতী! সেতীর সঙ্গে তো দেখা হয় নি আমাদের!'

'তাহলে তোমরা কি সোজা পথে আসো নি?'

'না সাব্! আমরা এসেছি খচ্চরের পথে।'

'খচ্চরের পথে!'

'জী সাব্। পথে ধস নেমেছে শুনে মণ্ডলসাব্ জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে খচ্চররা কোন পথে যাতায়াত করছে? বললাম সেই ঢাটমির গাঁও হয়ে চড়াই ও ঘোরা পথে। মণ্ডলসাব্ তখন বললেন, হামলোগ উসি খচ্চরকা রাস্তাসেই যায়েগা!'

সুতরাং ওরা খচ্চরদের রাস্তা দিয়ে এসেছে। ফলে মানুষদের পথে প্রতীক্ষারত সেতীরামের সঙ্গে দেখা হয় নি মণ্ডলের।.

শ্রান্ত সেতীরাম সন্ধ্যার বেশ কিছুক্ষণ বাদে বিশ্রামগৃহে পৌঁছল। আমরা তখন বারদুয়েক কফি শেষ করে আগুনের সামনে বসে আজকের কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা করছি।

দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকেই মেঝেতে বসে পড়ল সেতী। ছোট ছেলের মত ভেউ ভেউ করে কাঁদতে থাকল সে।

অনেক কষ্টে তার কান্না থামালাম। জিজ্ঞেস করলাম. 'কি হয়েছে? কাঁদছিস কেন?'

'নহী মিলা সাব্। মণ্ডলসাব্‌কো নহী মিলা। উনকো জরুর শের খা লিয়া।...ম্যায় ফির যাউঙ্গা, মুঝকো চার টর্চ দিজীয়ে। ম্যায় আট কুল্লি লেকর যাউঙ্গা। মণ্ডলসাব্‌কো জরুর লেকর আউঙ্গা।'

তার মানে যেভাবেই হোক বাঘের পেট থেকে মণ্ডলকে উদ্ধার করে নিয়ে আসবে সেতী।

হাসি পেল, কিন্তু হাসতে পারি না। গম্ভীর স্বরে প্রাণেশ বলে, 'পাশের ঘরে মামা রয়েছেন, তাঁর কাছ থেকে টর্চ নিয়ে আয়।'

চোখ মুছে উঠে দাঁড়ায় সেতী। সে ধীর পায়ে পাশের ঘরে ঢোকে। ঢুকেই দেখতে পায় মণ্ডলকে—খাটিয়ায় ঘুমাচ্ছে। নিজেকে আর সামলাতে পারে না সে। সোচ্চার স্বরে বলে ওঠে—আপ্ আগয়ে সাব্!

মণ্ডলের ঘুম ভেঙে যায়। সে পাল্টা প্রশ্ন করে—সেতী, এতক্ষণ কোথায় ছিলে? কখন এলে?.

—কিছুক্ষণ আগে সাব্। পশুপতিনাথের অশেষ কৃপা, আপনি ভালভাবে এসে গেছেন। তার কণ্ঠস্বরে পরম প্রশান্তির

প্রলেপ।

আশ্চর্য হয়েছি অভুক্ত ও শ্রান্ত সর্দারের সেই আচরণ দেখে। একবারও সে মণ্ডলকে বলল না নিজের কষ্টের কথা। বলল না যে মণ্ডলের জন্য তাকে সারাদিন না খেয়ে থাকতে হয়েছে, অন্ধকার দুর্গম পথে আলো ছাড়াই ছুটে আসতে হয়েছে।

একটু বাদে সেতী ফিরে আসে আমাদের ঘরে। সানন্দে বলে—মণ্ডলসাব্ বহুৎ হুঁশিয়ার আদমী, ঠিক চলা আয়া। বড় খুশীকা বাত্।

সেতী তখন আনন্দে যেন উপচে পড়ছে—তার মণ্ডলসাব্‌কে ফিরে পাবার আনন্দে। কে বলবে মাত্র কয়েক মিনিট আগেও সে শিশুর মতো কান্নাকাটি করছিল।

মামা জিজ্ঞেস করে—তোম্ খুশ হ্যায় সেতী?

—জী সাব্।

—তোম্ ব্লাডি ফুল?

—জী সাব্!

আমরা সমস্বরে হেসে উঠেছি। এবং সেতীও সানন্দে সেই অট্টহাসিতে যোগ দিয়েছে।

# সিন্ধুতীরে লাদাখ

ছোট বেলায় ভূগোলে পড়েছি ভারতের উত্তরসীমা হিমালয় কথাটা যে কতবড় ভুল, তা এই লাদাখে এসে বুঝতে পারছি। গতকাল সকাল নটায় শ্রীনগর থেকে রওনা হয়ে দুপুরে সোনামার্গ পৌঁচেছি। সেখানে মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ হবার পরে আবার 'বাস' ছেড়েছে। বলতাল পার হয়ে আমরা জোজি লা-য় আরোহণ করেছি। লাদাখী ভাষায় 'লা' মানে গিরিবর্ত্ম। জোজি লা কাশ্মীর হিমালয়ের গিরিবর্ত্ম।

মাত্র ১১,৫৭৮ ফুট উঁচু হয়েও জোজি লা হিমালয়ের একটি দুর্গমতম গিরিপথ। প্রচণ্ড তুষারপাতের মধ্যে জোজি লা দিয়ে হিমালয় অতিক্রম করে লাদাখের মাটি স্পর্শ করেছি। হিমালয়ের পরোপারে এসেছি। কিন্তু আমরা ভারতেই রয়েছি। ভারত এখানে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত প্রসারিত। সুতরাং হিমালয় ভারতের উত্তর সীমান্ত, এ কথাটা সত্য নয়।

জোজি লা পার হবার পর থেকেই শুরু হয়েছে লাদাখ। কিন্তু গতকাল গোধূলির ম্লান আলোয় লাদাখকে তেমন ভাল করে দেখা হয়ে ওঠে নি। সন্ধ্যা নাগাদ আমাদের বাস পৌঁচেছে দ্রাস— এশিয়ার শীতলতম জনপদ। সেখানে একগ্লাস গরম চা গলায় ঢেলে আরও ৫৬ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে রাত স্যাড়ে দশটায়

কার্গিল—শ্রীনগর থেকে ২০৩ কিলোমিটার।

কার্গিল একটি পাহাড়ী জনপদ। উচ্চতা ন'হাজার ফুটের মতো। সুতরাং সন্ধ্যে হবার সঙ্গে সঙ্গে এখানকার জনজীবনে তন্দ্রা নেমে আসার কথা। তাই গতকাল অত রাতে দোকান পাট ও হোটেল খোলা থাকতে দেখে অবাক হয়েছি। পরে বুঝেছি—শ্রীনগর এবং 'লে' (Leh) থেকে আসা শেষ বাসখানি না পৌঁছন পর্যন্ত কার্গিল ঘুমোতে যায় না। কারণ কাশ্মীর ও লাদাখের পথে সে বাসযাত্রীদের রাতের আশ্রয়। কাল রাতে কার্গিল তাই আমাদের জন্য জেগে বসেছিল।

হোটেলের লোকও দাঁড়িয়েছিল বাসষ্ট্যাণ্ডে—ক্রাউন হোটেল। লোকটি একটা ঠেলা ঠিক করে মালপত্র হোটলে নিয়ে এসেছে।

সুতরাং আশ্রয় পেতে কোন অসুবিধে হয় নি। আমরা হোটেলে চিঠি লিখেছিলাম। না লিখলেও বোধকরি অসুবিধে হত না। কারণ এখানে বহু হোটেল ও অন্যান্য আশ্রয়। তবে বাস থেকে নেমে একটু শীত করেছে। করারই কথা, আমরা ১৭৬৮ মিটার উঁচু শ্রীনগর থেকে একদিনে সোজা ২৬৫০ মিটারে উঠে এসেছি। তার ওপর লাদাখের শীত ভুবন বিখ্যাত। তবে হোটেলে পৌঁছবার পরে আর তেমন শীত টের পাই নি।

বাইরের বিদ্যুৎ এখনও এসে পৌঁছয় নি কার্গিল শহরে। তাহলেও এখানে বিদ্যুৎ আছে। রয়েছে একটি ডিজেল জেনারেটার প্রতিদিন সন্ধ্যায় সেটি গর্জে ওঠে, রাত ঠিক বারোটা পর্যন্ত চালু থাকে। ফলে কাল আমরা খেতে বসার আগেই হোটেলের আলো নিভে গিয়েছিল। কিন্তু তাতে কোন অসুবিধে হয় নি কারণ ব্যাপারটা আমাদের জানা ছিল। আমরা তার আগেই মোমবাতি জ্বালিয়ে নিয়েছিলাম।

বিদ্যুৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আলোর অভাব ঘটে নি। কিন্তু

আমরা তখন বড্ড নিঃসঙ্গ বোধ করেছি। কার্গিলে কোন কল-কারখানা নেই। জেনারেটরের শব্দটাই এখানকার একমাত্র যান্ত্রিক শব্দ। আমরা শহরের মানুষ। সুতরাং ঐ শব্দটাকে জীবনের স্পন্দনরূপে অনুভব করেছিলাম। শব্দটা থেমে যাবার পরে তাই কেমন একটা প্রাণহীন পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ শহরবাসীদের কাছে নৈঃশব্দ মৃত্যুর নামান্তর।

কিন্তু থাক, কালকের কথা আর নয়। আজকের কথায় আসা যাক। গতকাল রাতে বাস থেকে নামার সময়েই কণ্ডাক্টর বলে দিয়েছিল—সুবা পাঁচ বাজে আ যাই য়ে, সওয়া পাঁচমে বাস ছোড়েগী।

সুতরাং রাত সাড়ে বারোটায় শুয়ে আবার ভোর চারটায় বিছানা ছাড়তে হয়েছে। প্রচণ্ড শীতে কাঁপতে কাঁপতে তুষার শীতল জল দিয়ে বাথরুম সেরে কোন মতে বাঁধাছাদা শেষ করেছি তবু কুলি ডেকে আনতেই প্রায় পাঁচটা বেজে গিয়েছে।

তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছি বাসষ্ট্যাণ্ডে। এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছি। বুঝতে পেরেছি সর্দারজী সওয়া পাঁচটায় বাস ছাড়তে পারবেন না। কারণ অধিকাংশ যাত্রী এসে পৌঁছতে পারেন নি।

বাসের ছাদে মালপত্র তুলে দিয়ে আমরা চায়ের দোকানের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। এক গেলাস গরম চা হাতে নিয়ে কার্গিলকে দেখছি। গতকাল রাতে আমার তাকে দেখাই হয় নি। আজ তাই তাকে দেখছি আর ভাবছি—

কার্গিল লাদাখ জেলার দ্বিতীয় শহর এবং মহকুমা সদর। এই মহকুমাটি কাশ্মীর উপত্যকার উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। কার্গিল শহরের প্রায় চারিদিকেই পাহাড়ের প্রাচীর। এটি একটি মাঝারী আকারের উপত্যকা। উপত্যকার বুক বেয়ে নদী আর এই পথ—শ্রীনগর 'লে' জাতীয় সড়ক। 'লে' শহর আগে লাদাখ

রাজ্যের রাজধানী ছিল, এখন জেলাসদর। আমরা আজ সেখানেই চলেছি। লে শ্রীনগর থেকে ৪৩৪ কিলোমিটার! বাসে দুটি দিন সময় লাগে। এখন জনপ্রতি ভাড়া একশ' টাকার মতো।

কার্গিলে এই পথের ধারে বাড়ি-ঘর এবং পপলার আর উইলো গাছের সারি। বাড়িগুলোর অধিকাংশই দোতালা। একতলায় সারি সারি দোকান মুদি মনোহারী, জামা কাপড ও শয্যা দ্রব্য, বাসনপত্র তরি তরকারী ফল চা ও খাবারের দোকান। তারই একটি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ঊষার প্রথম আলোয় আমি কমনীয় কার্গিলকে দেখছি।

দ্রাস ও সুরু নদীর সঙ্গমে প্রাচীন জনপদ কার্গিল। দ্রাস এসেছে জোজিলা থেকে আর সুরু জাসকার থেকে। আরও কয়েকটি নদী কার্গিল উপত্যকার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে তাদের মধ্যে শিগার, সিংগো, ওয়াখা এবং সিন্ধুনদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সুরু ও দ্রাসের মিলিত ধারা সোজা উত্তরে প্রবাহিত হয়ে মারোল নামে একটা জায়গায় সিন্ধুনদে বিলীন হয়েছে। এই নদীর তটভূমি দিয়ে কার্গিল শহর থেকে সিন্ধু উপত্যকার দূরত্ব মাত্র বিশ কিলোমিটার। কিন্তু যুদ্ধ বিরতি চুক্তি মানতে গিয়ে আমরা এই অঞ্চলটি পাকিস্তানকে উপহার দিয়েছি।

সিন্ধু উপত্যকার কথা পরে হবে, এখন কার্গিলের কথাই ভাবা যাক। সুপ্রাচীন কাল থেকেই কার্গিল একটি বড় জনপদ ও জনপ্রিয় ব্যবসাকেন্দ্র। এখানে জনপদ গড়ে ওঠার কারণ এটি একটি সুবিশাল উপত্যকা। তুলনায় এখানকার উচ্চতা কম এবং শীত সহনীয় মাটিও মোটামুটি উর্বর। এখানে প্রচুর খুবানি (Apricot) গাছ জন্মায় এবং এই ফলটি আজও কার্গিলের মানুষদের অন্যতম প্রধান খাদ্য।

কার্গিল একটি বড় ব্যবসাকেন্দ্র রূপে গড়ে ওঠার কারণ লাদাখের এই উষ্ণ এবং উর্বর উপত্যকাটি রাশিয়া-চীন-আর্যাবর্ত্ত বাণিজ্য পথের উপরে অবস্থিত। অবস্থানটিও চমৎকার—এখান থেকে 'লে' এবং শ্রীনগরের দুরত্ব প্রায় সমান। আর তাই কার্গিল আজও এই পথে রাতের আশ্রয়। ফলে এখানে গড়ে উঠেছে কিছু সরকারী আশ্রয় এবং বেশ কয়েকটি বেসরকারী হোটেল।

ইদানিং জাঁসকার উপত্যকার সদর পান্দুম পর্যন্ত মোটর পথ প্রসারিত হওয়ায় কার্গিলের মূল্য আরও বেড়ে গিয়েছে। পর্যটকদের প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিষপত্র পাওয়া যায় এই বাজারে। কেবল পাওয়া যাবে না মদ। কারণ স্থানীয় অধিবাসীদের অধিকাংশই সিয়া মুসলমান। তাঁরা মদ স্পর্শ করেন না।

কার্গিল একটি পর্ব্বতময় মহকুমা—উচ্চতা ৮,৫০০ ফুট থেকে ১১৫০ ফুট কিন্তু শীত কম এবং মাটি উর্বর বলে এখানে নদীর ধারে প্রচুর পাপ্‌লার এবং উইলো গাছ জন্মায়। লাদাখ বৃষ্টিহীন ভূখণ্ড। তাহলেও এই উপত্যকায় সামান্য বৃষ্টি হয়। ফলে এখানে কিছু গম যব শাকসব্জী ও ফল জন্মায়।

কার্গিল মহকুমার সরকারী নাম পুরিগ। স্থানীয় ভাষার নামও পুরিগভাষা। স্বাভাবিক কারণেই পাকিস্তান অধিকৃত স্কার্দু অঞ্চলের ভাষার সঙ্গে এই পুরিগ ভাষার মিল খুব বেশি। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানী হানাদাররা স্কার্দু ও গিলগিট সহ প্রায় সমগ্র পশ্চিম বাল্‌তিস্তান দখল করে নেয়। তথাকথিত শান্তির জন্য যুদ্ধবিরতির নামে সেই অন্যায় অনুপ্রবেশ অনুমোদন করে জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের উত্তর পশ্চিমাংশ অর্থাৎ কারাকোরাম পর্বতশ্রেণীর দক্ষিণ পাদদেশটি আমরা পাকিস্তানকে উপহার দিয়েছি। এই অবিমৃশ্যকারিতার জন্য যে কেবল আমাদের দুর্ভোগ সইতে হচ্ছে তা নয়, আফগানিস্তানকেও এর খেসারত দিতে হচ্ছে। কারণ পাকিস্তান কেবল

ইসলামী রাষ্ট্র নয়, নাদির শাহের আগ্রাসী আত্মাটি জন্ম মুহূর্ত থেকেই তার কাঁধে ভর করে রয়েছে।

কার্গিল লাদাখের দ্বিতীয় শহর। বলাবাহুল্য প্রথম শহর 'লে' আপাতত আমাদের গন্তব্যস্থল। কার্গিল তহশীল সদর, স্থায়ী জনসংখ্যা হাজার তিনেকের মতো। ১৯৭১ সালের জনগণনা অনুযায়ী জ'াসকার সহ সমগ্র কার্গিল মহকুমার জনসংখ্যা ৫১,৫৩৯ জন। এবারে গণনায় অর্থাৎ গত দশ বছরে এই সংখ্যা নিশ্চয়ই কিছু বেড়েছে। তবে এই বৃদ্ধির হার সমতলের চেয়ে অনেক কম হবে। কারণ গত দেড় বছরে লাদাখের জনসংখ্যা প্রায় কিছুই বাড়ে নি। ১৮২২ সালে প্রখ্যাত পর্যটক উইলিয়াম মুরক্রফট অখণ্ড লাদাখের জনসংখ্যা এক লক্ষ আশি হাজার বলে অনুমান করেছেন। তখন বালতিস্থান ও লাহুল স্পিতি লাদাখের মধ্যে ছিল। ঐ দুটি অঞ্চল বাদ দিয়ে ১৯৭১ সালে লাদাখের জনসংখ্যা ছিল ১,০৫,০০১। অথচ আয়তনের হিসাবে আজও লাদাখ জম্মু কাশ্মীর রাজ্যের বৃহত্তম জেলা। চীন এবং পাকিস্তানের দখলের পরেও এই জেলার আয়তন ৭৭,২০০০ বর্গমাইল।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি না পাবার প্রধান কারণ বহুপতি প্রথা এবং লামাতন্ত্র। কিন্তু এসব কথা এখন থাক। লাদাখীদের শতকরা ৮৮ জনই কৃষিজীবী। লাদাখের প্রধান শস্য, যব ও গম। চাষের জমির আয়তন প্রায় ৪৫,০০০ একর। সবই কৃত্রিম জল সেচের ওপরে নির্ভরশীল। লাদাখে চারটি কৃষি-খামার আছে। তার একটি এই কার্গিলে। বাকি তিনটি নূররা, চাওথান ও সাসপোলে অবস্থিত।

কার্গিলের অধিকাংশ আদিবাসী মুসলমান। সুতরাং এখানে আরবী শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। আছে দুটি মসজিদ তার একটির নাম জুমা মসজিদ। ছোট হলেও শুনেছি সুন্দর। যাবার পথে

বাস থেকে মসজিদটি দেখতে পাবো।

স্বাভাবিক কারণেই কার্গিলের মেয়েরা পর্দানসীন। তাঁরা বড় একটা পথে বের হন না। এখন পর্যন্ত আমরা কার্গিলে কোনো স্থানীয় মহিলা দেখতে পাই নি।

কার্গিলের প্রধান পথ এই একটাই, শ্রীনগর-লে রোড। রাস্তাটি উত্তর পূব থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে প্রসারিত! শহরে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য আরেকটি ছোট মোটর পথ নির্মিত হয়েছিল। সেটি উত্তর থেকে সোজা দক্ষিণে বিস্তৃত ছিল। এই পথটাই এখন জাঁসকার মহকুমার সদর পান্দুম পর্যন্ত প্রসারিত। মাত্র কিছুদিন হল এটির নির্মাণকার্য শেষ হয়েছে!

গতকাল কার্গিল শহরে প্রবেশ করে পথের ডানদিকে আমরা প্রথম পেয়েছি পাঠাগার। তারপরে থানা ও ডাকঘর। অবশেষে এই বাজার বাসষ্ট্যাণ্ড—আমি যেখানে দাঁড়িয়ে এখন কার্গিলকে দেখছি। আমার বাঁদিকে 'আরগালি' এবং ডি লুক্স হোটেল, ডানদিকে ফ্রন্টিয়ার হোটেল, ডিষ্ট্রীক্ট এডুকেশান অফিসারের অফিস, সরকারী মডেল প্রাইমারী স্কুল এবং হাইস্কুল। তারপরে টীচারস্ ট্রেনিং স্কুল ও নির্মাণ বিভাগের বিশ্রাম ভবন। সেখানে তাঁবু ভাড়া পাবারও ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে একটা ট্যুরিষ্ট হোটেল এবং রেস্তোরাঁ আছে। সেটি আরও খানিকটা এগিয়ে এই 'লে' সড়কের ওপরে অবস্থিত। যাবার পথে দেখতে পাবো।

আর বেশ কয়েকটা হোটেল আছে, এই কার্গিল, শহরে। তার মধ্যে 'জোজি লা', 'দি সুরু ভিউ' এইং 'ইয়াক টেইল' হোটেলের নাম শুনেছি! তবে 'ক্রাউন' হোটেলটি বাসষ্ট্যাণ্ড থেকে একটু দূরে হলেও আমাদের মতো মধ্যবিত্ত পর্যটকদের পক্ষে খুবই ভাল।

কার্গিলের কথা বলতে হলে জাঁসকারের কথা ভাবতেই হবে।

কারণ জাঁসকার কার্গিলের ছোট ভাইয়ের মতো। জাঁসকার শব্দের অর্থ তামা। দুটি পাহাড়ী নদীর মধ্যবর্তী উপত্যকা জাঁসকার—গড় উচ্চতা ১৩,১৫৪ ফুট। তাহলেও মোটামুটি ফসল জন্মায়। পাপ্‌লার গাছও শুনেছি প্রচুর আছে।

জাঁসকার কার্গিলের দক্ষিণে অবস্থিত আর জাঁসকারের দক্ষিণে হিমাচল প্রদেশের লাহুল উপত্যকা। কার্গিল থেকে জাঁসকারের মোটর পথটি এই সুরু নদীর তীরে তীরে ৪৪০১ মিটার উঁচু পেন্‌সি লা পার হয়ে জাঁসকার তহশিলের সদর পাদুম পৌছতে হয়। পথে পড়ে রাংডুম গুম্ফা। মানালী থেকেও লাহুলের ভেতর দিয়ে পাদুমের একটা হাঁটাপথ আছে। ৯/১০ দিন সময় লাগে।····

কিন্তু কার্গিলের ভাবনা আর নয়। ড্রাইভার হর্ণ দিচ্ছে। চায়ের গ্লাস ফেরৎ দিয়ে বাসের দিকে এগিয়ে চলি।

সকাল ঠিক পৌনে ছটায় বাস ছাড়ল। বাজারের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চললাম। শীতের দেশ, সবে ভোর হয়েছে। তবু এরই মধ্যে বেশ কিছু দোকান খুলে গিয়েছে। জুমা মসজিদকে বাঁদিকে রেখে বাজার ছাড়িয়ে এলাম।

সুরুর সঙ্গে দেখা হল—জাঁসকারের সুরু নদী! এখানে এসে দ্রাস নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। অপরূপ সঙ্গমটি দেখা যাচ্ছে অনতিদূরে। কিন্তু সেদিকে না এগিয়ে পথটা ডাইনে বাঁক নিল। আর সেই বাঁকের মুখে, নদীর তীরে একফালি বনভূমি—উইলো আর পাপ্‌লারের বন। বন ছাড়িয়ে উপত্যকা—ধাঁপে ধাঁপে ক্ষেত। চমৎকার জলসেচের ব্যবস্থা। ক্ষেত আর বনের মাঝে বাড়ি-ঘর—গ্রাম। শুনেছি পাঁচ থেকে দশটি পরিবারের জন্য এক একটি গ্রাম। সেই গ্রামের ক্ষেত খামার সবই তাদের। ভারী ভাল লাগছে দেখতে।

একটা পুল পেরিয়ে সুরুর অপর তীরে এলাম। তাই আসতে হবে। কারণ সুরু তথা সুরু ও দ্রাসের মিলিত ধারার সঙ্গে এগিয়ে যাবার সাধ্য নেই আমাদের। কারণ আগেই বলেছি - সেপথ হানাদার অধিকৃত।

সুরু প্রবাহিত হচ্ছে উত্তর পশ্চিমে আর আমরা চলেছি দক্ষিণ পূর্বে তারই তীরভূমি ধরে। দু-তীরেই উর্বরা উপত্যকা। দেখতে দেখতে চলেছি। এপার থেকে ওপারের দৃশ্য আরও সুন্দর তাই নিয়ম। সুন্দর সর্বদা দূর থেকে সুন্দরতর।

এই উপত্যকার পাশেই জাঁসকার পর্বতশ্রেণী আমাদের দক্ষিণে বেশ কয়েকটি উঁচু শিখর রয়েছে জাঁসকারে। তাদের মধ্যে প্রথম মনে পড়ছে 'নুন' ও 'কুন' শৃঙ্গ দুটির কথা। উচ্চতা ৭১৩৫ ও ৭০৭৭ মিটার। তাছাড়া জাসকার ছাড়িয়েই কিস্তোয়ার হিমালয়। সেখানে রয়েছে 'সিকল মুন' (৬৫৭৫ মিটার) ও 'পিনাকেল্' (৬৯৩০ মিঃ) ও ব্রহ্মা (৬৪১৬ মিঃ) পর্বত।

জাঁসকার পর্বতশ্রেণীর ওপারে জাঁসকার উপত্যকা তারপরে পীরপাঞ্জাল পর্ব্বতমালা। পীরপাঞ্জালের পরোপারে লাহুল। আর আমাদের উত্তর পূর্বে কারাকোরাম পর্বত শ্রেণী।

কারাকোরামের শৃঙ্গ নাঙ্গা পর্বত (৮১২৬ মিঃ)। এটি বিশ্ব পর্বতারোহণের ইতিহাস 'Killer Mountain' বা খুনী পাহাড় নামে কুখ্যাত।

গতকাল আমরা হিমালয় অতিক্রম করেছি, আজ এগিয়ে চলেছি কারাকোরামের দিকে। কারাকোরামের সংলগ্ন সিন্ধু উপত্যকায় পদচারণা করার জন্যই আমরা আজ লাদাখের পথে। সেই কারাকোরাম এখন আমার উত্তর পূর্বে। এই পর্বত শ্রেণীর প্রধান শৃঙ্গ হল ৮৬১১ মিটার (২৮,২৪৪) উঁচু মাউন্ট গডউইন অস্টিন বা সংক্ষেপে 'K²'। এটি বিশ্বের দ্বিতীয় উচ্চতম পর্বত-

শিখর। কারাকোরামের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শৃঙ্গ হল গাসেরব্রুম ও মাসেরব্রুম। উচ্চতা যথাক্রমে ৮০৬৮ ও ৭৮২১ মিটার।

কিন্তু কারাকোরামের কথা এখন থাক। আমাদের কথা হোক। সুরু নদীর তীর ধরে আমরা দক্ষিণ পূর্বে এগিয়ে চলেছি। নদীর ওপারে অনেকটা দূরে আর এপারে পথের পাশে পাহাড়ের সারি। তাদের শিরে শিরে সকালের সোনালী রোদ।

সবে সকাল সওয়া ছ'টা। সব পাহাড়ের গায়ে এখনও রোদ পৌঁছয় নি। সেখানে কুয়াশা আর পাহাড়ের লুকোচুরি খেলা চলেছে।

রোদ নয়, কুয়াশা নয়, পাথর। আমি অপলক নয়নে শুধু পাথর দেখছি। প্রখ্যাত হিমালয় পথিক ও সুমহান শিল্পী শ্রদ্ধেয় মণি সেন মহাশয় একদিন বলেছিলেন— যদি পাথরের রং দেখতে চাও, তাহলে একবার লাদাখ যেও।

কথাটা যে কতখানি সত্যি, তা লাদাখে এসে আজ আমি এই প্রথম প্রভাতেই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলাম। এক একটি পাহাড়ের এক এক রকমের রং। কোনটি কালো, কোনটি ধূসর, কোনটি খয়েরী, কোনটি লাল, কোনটি বা গোলাপী—আরও কত রং।

শুধু রং নয়। বিচিত্র তাদের গড়ন। অধিকাংশই সাধারণ পাহাড়ের মতো ত্রিভুজাকৃতি নয়। কোনটি মন্দিরের মতো, কোনটি মসজিদ কিম্বা গীর্জার মতো। কোনটি বা ভগ্ন দুর্গের মতো। ভারী সুন্দর—যেন পটে আঁকা ছবি। মনে হচ্ছে হাজার হাজার শিল্পী শত শত বছরের শ্রান্তিহীন শ্রম দিয়ে সৃষ্টি করে রেখেছেন।

পাহাড়ের গা বেয়ে আলপনার মতো পথ। পাহাড়ে গাছপালা নেই। কিন্তু মাঝে মাঝে নিচে নদীর ধারে সবুজ খেত আর পপলারের বন। এই উর্বর উপত্যকার প্রতি পাকিস্তানের লোভ

সুবিদিত। তাই স্বাধীনতার প্রহরী জওয়ানদের সর্বদা সজাগ থাকতে হয়।

উচ্চতা যাই হোক। মসৃণ ও প্রায় সমতল পথ। বাস বেশ জোরে চলেছে। শুধু পথ নয়, আবহাওয়াও চমৎকার। তবে পথের ওপর এখনও রোদ এসে পৌঁছতে পারে নি। দূরে রোদ দেখতে পাচ্ছি। আমরা তার উষ্ণ পরশের প্রতীক্ষায় রয়েছি।

এ পথ লাদাখের প্রাচীন রাজধানী 'লে' নগরীর পথ। সুপ্রাচীন কাল ধরে যে নগর হয়ে সংখ্যাতীত পথিকের দল তিব্বতে ও চীন থেকে সমতল ভারতে এসেছেন, আর্যাবর্ত থেকে মধ্য এশিয়ায় গিয়েছেন। কেউ এসেছেন পণ্য সম্ভার নিয়ে কেউ গিয়েছেন ধর্মপ্রচার করতে, কেউ রাজনৈতিক কারণে আবার কেউবা নিছক ভ্রমণে। মনে মনে তাদের কথাই ভেবে চলি, বিগত যুগের সেইসব দুঃসাহসী পর্যটকদের কথা—

লাদাখকে বলা হয় 'লিটল টিবেট' বা ক্ষুদ্র-তিব্বত। লাদাখের পাহাড় বৃক্ষহীন, মাটিতে বালির ভাগ খুব বেশি। কিন্তু সে বালির সোনালী রং। লাদাখের আকাশ ঘন নীল—সে আকাশে মেঘ নেই। দূরের বৃক্ষহীন পাহাড়গুলো সেই নীলাকাশকে চুম্বন করেছে। দুপুরের উজ্জ্বল রোদে লাদাখকে মনে হয় চাঁদের দেশ। তাই লাদাখের অপর নাম 'মুন ল্যাণ্ড'।

এই বৃক্ষহীন মরুভূমি সদৃশ চাঁদের দেশেও মাঝে মাঝে মরুদ্যানের মতো পাহাড়ে ঘেরা সবুজ উপত্যকা রয়েছে। আর লাদাখের এই বিচিত্র সুন্দর প্রকৃতি যুগ যুগ ধরে দূর দেশের পর্যটকদের আকর্ষণ করে চলেছে। তাঁদের কেউ এসেছেন এই উঁচু দেশের ভৌগোলিক তথ্য আহরণ করতে, কেউ এসেছেন জাতিবিদ্যা অথবা নৃবিদ্যা নিয়ে গবেষণা করতে—তাঁদের মতে লাদাখ পৃথিবীর প্রাচীনতম মনুষ্য বসতির অন্যতম। কেউ

এসেছেন বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে আবার কেউ বা এসেছেন শুধুই লাদাখের এই পাহাড়গুলো দেখতে—যে পাহাড়গুলো নাকি কোটি কোটি বছর ধরে সমুদ্রের তলায় ঘুমিয়েছিল। তবে যিনি যে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এই দেশে এসে থাকুন, তিনিই কিন্তু এ দেশের সরল সেবাপরায়ণ মানুষগুলির উষ্ণ আতিথ্যে অভিভূত হয়েছেন।

যে দুজন বিদেশী পর্যটক তাদের ভ্রমণকাহিনীতে প্রথম এই সুপ্রাচীন দেশের কথা লিখে গিয়েছেন, তারা দুজনেই চৈনিক। তাঁদের নাম 'ফা হিয়েন' এবং 'ও-ঙক'। তাঁরা আনুমানিক ৪০০ খ্রীস্টাব্দে এদেশে আসেন।

লাদাখের ভূ-সংস্থান ( Topography ) সম্পর্কে আমরা প্রথম বিবরণ পাই অনেক পরে, মাত্র ষোড়শ শতাব্দীতে মির্জা হায়দার দুগলাত-এর 'তারিখ-ই-রসিদী' গ্রন্থে। দুগলাত .১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে লাদাখ আক্রমণ করেছিলেন।

লাদাখ প্রথম পাশ্চাত্য পর্যটক দিয়াগো দ্য আলমেরা। এই পর্তুগীজ পর্যটক ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ লাদাখে আসেন এবং দু বছর এখানে থাকেন।

তারপরে লাদাখে আসেন দুজন জেস্যুইট মিশনারী। তাঁদের নাম ফাদার এফ. দ্য এ্যাজেভেদো এবং জি. দ্য অলিভিরো। তাঁরা ১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দে লাদাখ আসেন।

ডিসিদেরি এবং ফ্রেইয়ার নামে আরও দুজন জেস্যুইট মিশনারী ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে লাদাখ আসেন। তাঁরা শ্রীনগর থেকে তিব্বতের রাজধানী লাসা যাবার জন্য ২৬শে জুন লে শহরে উপস্থিত হন।

১৭২১ খ্রীষ্টাব্দে ডিসিদেরিকে লাসা থেকে আবার ডেকে পাঠানো হয়। এবং তার পরেই তিব্বতে মিশনারী কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়। ফলে পরবর্তী প্রায় শ'খানেক বছর কোনো

য়ুরোপীয় পর্যটক 'লে' আসেন নি।

উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপ থেকে লাদাখে আসেন সেই দুই প্রখ্যাত পর্যটক উইলিয়াম মুরক্রফ্‌ট এবং জর্জ ট্রেবেক। তারা তাদের ছ'বছর ব্যাপী (১৮১৯-১৮২৫ খ্রীঃ) সুদীর্ঘ হিমালয় ও মধ্যএশিয়া অভিযানকালে বেশ কিছুদিন লে শহরে বাস করেছেন।

ডঃ হেণ্ডারসন নামে জনৈক পাশ্চাত্য পর্যটক ইসমাইল খান নাম নিয়ে বণিকের ছদ্মবেশে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে লে শহরে আসেন। তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভিয়েঁা (vigne) নামে আরেকজন য়ুরোপীয় পদযাত্রী লে শহরে পদার্পণ করেন।

তারপরে আসেন প্রখ্যাত বৃটিশ শাসক ও ঐতিহাসিক স্যার আলেকজাণ্ডার ক্যানিংহ্যাম। তিনি ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে 'লাদাখ' আসেন এবং 'Ladak' নামে একখানি প্রামাণ্য ও সুবৃহৎ পুস্তক প্রণয়ন করেন। বইখানি ১৮৫৩ সালে প্রকাশিত হয়। এর আগে লাদাখের ওপর রচিত এমন বিস্তৃত গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি।

এ্যাডলফ এবং রবার্ট স্লাজিন্টোইট নামে দুজন জার্মান পর্যটক ১৮৫৬ সালে রোতাং গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে মানালী থেকে লাহুল হয়ে 'লে' আসেন।

ভূতাত্ত্বিক জনসন ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে লে আসেন। তিনিই প্রথম লাদাখের ভৌগোলিক সমীক্ষা করেন।

১৮৬৭ সালে বৃটিশ শাসক 'শ' (Show) রাজনৈতিক মিশনে ইয়ারখন্দে যাবার পথে কয়েকদিন লে শহরে বাস করেন।

পরের বছর 'হেওয়ার্ড' শ্রীনগর লে সড়ক জরীপ শুরু করেন। এই কাজ করতে তাঁর দু-বছর সময় লেগেছে।

১৮৭৩ সালে ফোরসিথ, লোন্ডেন, ট্রাটার এবং হেণ্ডারসন প্পামির যাবার পথে লে আসেন। তারাও কাশ্মীর ও তুর্কিস্তানের

স্বার্থ সংক্রান্ত একটি রাজনৈতিক মিশনে সেখানে গিয়েছিলেন।

১৮৮১ সালে প্রথম একজন বিদেশী মহিলা লাদাখ ভ্রমণে আসেন। তার নাম মিসেস উজ্জি ফারভি। তিনি তার স্বামীর সঙ্গে রাশিয়া থেকে কারাকোরম গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে লে এসেছিলেন।

১৮৯০ সালে র‍্যানসডেল খোতান হয়ে লে শহরে উপস্থিত হন। পরের বছর বাওয়ার লাদাখ আসেন।

ওয়েলবি এবং ম্যাল্‌কম ১৮৯৬ সালে আবার লাদাখ অঞ্চল জরীপ করেন।

এই সময় মোরেভিয়ান মিশনারীরা লে শহরে বেশ গুছিয়ে বসেছেন। প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে পুস্তক প্রণয়ন শিক্ষা বিস্তার, কুটির শিল্পের বিকাশ, পথ নির্মাণ, চিকিৎসা প্রভৃতি বিভিন্ন সমাজ সেবার কাজও তারা করতেন। এই মিশনের ডাঃ কার্ল মার্কস ( কমিনিজমের জনক 'Kapital' রচয়িতা Dr. Heinrich Karl Marx নন ) 'Books of the Kings of Ladakh' নামে একখানি বই অনুবাদ করেন। তার সুযোগ্য শিষ্য এই মিশনের এ. এইচ. ফ্রাঙ্কি প্রভূত পরিশ্রম করে লাদাখের একখানি ইতিহাস রচনা করেন। বই খানির নাম 'History of Western Tibet'। ১৯০৭ সালে প্রকাশিত এই বইখানি আজও লাদাখের একখানি শ্রেষ্ঠ ইতিহাস রূপে সমাদৃত।

আমার এই স্মৃতিচারণের শেষ অভিযাত্রী ডঃ স্বেন হেডিন ( Sven Hedin )। তিনি লাদাখের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিব্রাজক। ডঃ হেডিন প্রায় সমগ্র লাদাখ ও তিব্বতের বিস্তৃত সমীক্ষা করেন। ১৮৯৯ থেকে ১৯০২ এবং ১৯০৬ থেকে ১৯০৮ এই পাঁচ বছর তিনি তিব্বত ও লাদাখের পথে প্রান্তরে পাহাড়ে পর্বতে ও গ্রামে গঞ্জে ঘুরে বেরিয়েছেন। ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং বিনাস্বার্থে আর কেউ

হিমালয় ও কারাকোরাম অঞ্চলের এমন বিস্তৃত সমীক্ষা করেছেন বলে জানা নেই আমার।

সেই সমীক্ষার ওপরে রচিত হেডিনের 'Trans Himalaya' বইটি ১৯১০ সালে প্রকাশিত। তিনটি খণ্ডে বিভক্ত প্রায় তের শ' পৃষ্ঠার এই সুবৃহৎ বইখানি বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডারে একখানি অমূল্য সম্পদ।

সেকালে যখন পথ ছিল না, ছিল না পর্বতারোহণের সাজ-সরঞ্জাম এবং কলের গাড়ি, তখন এইসব মৃত্যুঞ্জয়ী অভিযাত্রীরা অমানুষিক দুঃখকষ্ট সহ্য করে এই অজানা জগতের সঙ্গে বিশ্ববাসীর পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। তাদের আত্মত্যাগ ও মানবপ্রেম বিশ্ব ইতিহাসের অক্ষয় অধ্যায়। তাদের প্রত্যেকের প্রতি রইল আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

## দুই

একটি ছোট গিরিবর্ত্ম পেরিয়ে আমরা সুরু উপত্যকা থেকে ওয়াখা উপত্যকায় উপস্থিত হলাম। গিরিবর্ত্মটি কেবল দুটি উপত্যকার মিলনভূমি নয়, দুটি ধর্মেরও সঙ্গম। একটি ইসলাম—কার্গিল অঞ্চলের ধর্ম, অপরটি বৌদ্ধ—লাদাখ মূল-ভূখণ্ডের ধর্ম।

বাস এগিয়ে চলেছে। সামান্য চড়াই। বিস্তৃত উপত্যকার ওপর দিয়ে পথ। উপত্যকার দু-দিকেই নেড়া পাহাড়—বিচিত্র বর্ণের বিচিত্র গড়নের অসংখ্য পাহাড়। কোনটি মাটির ঢিবির মতো, কোনটি দেবালয়ের মতো, কোনটি হাতি কিম্বা ঘোড়ার মতো আবার কোনটি বা বিশালকায় মানুষের মতো। আমরা দেখতে দেখতে পথ চলেছি বেশ লাগছে।

শার্গোল এসে গেল। ছোট গ্রাম শার্গোল। দূরত্ব শ্রীনগর থেকে ২৩৭ কিলোমিটার। তার মানে আমরা কার্গিল থেকে

৩৪ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিলাম। এখন সকাল সাতটা।

গতকাল শ্রীনগর থেকে রওনা হবার বাইশ ঘণ্টার মধ্যে আমরা শার্গোল পেঁৗছে গেলাম। এতেও আমরা খুশি নই। অথচ হেডিন সাহেবের শ্রীনগর থেকে এখানে আসতে বারোদিন সময় লেগেছিল। তারিখটা ছিল ১৯০৬ সালের ২৭শে জুলাই। সেকালের অভিযাত্রীরা কত কষ্ট করে হিমালয়ের পথ পাড়ি দিতেন।

পথের ডানদিকে নদীর অস্তিত্ব অনুভব করছি। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না। কেবল দেখছি পাহাড়ের গায়ে মাঝামাঝি জায়গায় একটি গুম্ফা, ছোট গুম্ফা মানে তিব্বতের অনুকরণে বৌদ্ধ দেবালয়।

কথাটা মনে পড়ে আমার, হেডিন লাদাখে এসে প্রথম এই গুম্ফাটি দর্শন করেন। আমরাও পথে এই প্রথম গুম্ফা পেলাম। পঁচাত্তর বছর পরেও লাদাখ বুঝি বা একই রয়ে গিয়েছে।

পাহাড়ের পাদদেশে কিছু গাছপালা আর কয়েকফালি চাষের জমি নিয়ে শার্গোল। প্রকৃত পক্ষে প্রথম লাদাখী গ্রাম। লাদাখী বলতে আমরা যাঁদের বুঝে থাকি, তাঁদেরই কয়েকজনকে পথের পাশে দেখতে পাচ্ছি। কার্গিল লাদাখে হলেও কার্গিলবাসীদের লাদাখী বলে না। শুনেছি পঁয়ত্রিশ খানি ঘর আর ২১০ জন বাসিন্দা নিয়ে এই শার্গোল গ্রাম। গ্রাম আর গ্রামের মানুষদের দেখতে দেখতে এগিয়ে চলি।

'মুলবেখ!' সহসা জনৈক সহযাত্রী বলে ওঠে।

বাস থামে। ড্রাইভার ইঞ্জিন বন্ধ করে দেয়।

দলনেতা বলে, বাস থেকে নামতে হবে। এখানে একটা বড় মূর্তি আছে। অদৃষ্ট ভাল হলে মূর্তি দর্শনের পরে এক গ্লাস গরম চা পেয়ে যাবেন।

এই শীতের সকালে এর চেয়ে সুসংবাদ আর কি হতে পারে? অতএব তাড়াতাড়ি নেমে আসি পথে। আর সঙ্গে সঙ্গে সোনালী মিঠে রোদ তার উষ্ণবাহু বাড়িয়ে সস্নেহে আলিঙ্গন করে আমাকে। আমি আমোদিত হয়ে উঠি।

গতকাল বৃষ্টি মাথায় করে শ্রীনগর থেকে রওনা হয়েছিলাম। সারাদিন রোদ দেখতে পাই নি। আজ অবশ্য বাসে বসে অনেকক্ষণ থেকেই রোদের লুকোচুরি খেলা দেখেছি। কিন্তু তার পরশ পাই নি। এই প্রথম তার উষ্ণ মধুর স্পর্শ লাভ করলাম। সঙ্গে সঙ্গে শরীরের সমস্ত অণু-পরমাণু পুলকিত হয়ে উঠল।

ঘড়ি দেখি—সওয়া সাতটা। তার মানে দেড়ঘণ্টায় আমাদের বাস ৪১ কিলোমিটার এসেছে। মূলবেখ মূর্তি শ্রীনগর থেকে ২৩৪ কিলোমিটার।

বাস দাঁড়িয়েছে পথের বাঁদিকে। আমরা পথের ডানদিকে আসি। পথের পাশে ঢালু জায়গা। তারপর একটা ছোট পাথুরে পাহাড়। সেই পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা সুবিশাল দণ্ডায়মান মূর্তি। এটি চাম্বা মুর্তি নামে বিখ্যাত। লাদাখীরা বলেন মৈত্রেয় বা ভবিষ্যবুদ্ধ।

বৌদ্ধদের মতে তথাগত হলেন গৌতমবুদ্ধ। তাঁর আগে কয়েকজন বুদ্ধের আগমন ঘটেছে এবং তাঁর পরেও কয়েকজন বুদ্ধের আগমন ঘটবে। তথাগতের আগে যিনি এসেছিলেন তাঁর নাম দীপঙ্কর বুদ্ধ এবং পরে যিনি আসবেন তিনিই মৈত্রেয় বুদ্ধ। ইনি মৈত্রীর মহামন্ত্র প্রচার করবেন।

আমরা অবশ্য এতসব বুঝি নে। আমাদের কাছে সবই এক। প্রেম আর মৈত্রীর পরমাবতার গৌতমবুদ্ধ।

তাঁকে দর্শন করি—তাঁর চোখদুটি অর্ধনিমীলিত। যেন

জগতের মঙ্গল কামনায় ধ্যান করছেন। চতুর্ভুজ মূর্তি একহাতে কমণ্ডলু একহাতে মালা একখানি হাত খালি আর অপর হাত-খানিতে কি আছে বুঝতে পারছি না এখান থেকে। তবে তাঁর গলার হার ও উপবীত পরিস্কার দেখা যাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছি তাঁর অনিন্দ্যসুন্দর অথচ পরমপ্রশান্ত মুখশ্রী। আমরা প্রণাম করি।

পথের পাশে পর্যটকদের জন্য একখানি সাইনবোর্ড লেখা রয়েছে—'This Statue of Maitreya was carved probably in First Century B C. during Kushan period.
This is a Landmark in the History of Ladakh.'

মূর্তির পাশে পাহাড়ের ওপর ছোট একখানি ঘর—গুম্ফা। হালে তৈরী - ১৯৭৫ সালে। এই মূর্তি দেখা শোনা করার জন্য জনৈক লামা বা সন্ন্যাসী বাস করছেন ওখানে।

ড্রাইভার হর্ণ দিচ্ছে। তাড়াতাড়ি গাড়ির কাছে আসি। কিন্তু নেতা যে বলেছিল, একগ্লাস গরম চা পাওয়া যাবে! কোথায়? এখানে কোনো দোকান দেখতে পাচ্ছি না তো!

উঠে আসি গাড়িতে একটু বাদে বাস চলতে শুরু করে। নেতার দিকে তাকাই।

সে বলে, 'আমি ভুল বলেছিলাম, এখানে চা পাওয়া যায় না। তবে চা পাবেন।'

'কখন?'

'এখুনি। এখান থেকে মাত্র এক কিলোমিটার দূরে মুলবেখ গ্রামে।'

মিনিট তিনেকের মধ্যে মুলবেখ গ্রামে বাস থামে। নেমে আসি পথে। বাঁদিকে প্রাচীন রাজপ্রাসাদ। তারই চারিদিকে ঘর-বাড়ি মুলবেখ গ্রাম।

গ্রামের ওপরে পাহাড়ের ঢালে একজোড়া গুম্ফা সারচুং এবং গ্যাঙেণ্টসে। গ্রাম থেকে গুম্ফায় যাবার দুটি পায়ে চলা পথই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে। তবে দুটি পথই যেমন সরু, তেমনি খাড়া। সুতরাং মন্দির দর্শনের পুণ্যকর্মটি কোন মতেই সহজ নয়।

শুনেছি ঐ গুম্ফা থেকে ওয়াখা উপত্যকার দৃশ্য খুবই বৈচিত্র্যময়। হেডিনের ভাষায়—'The fantastic contours of the mountains stand out sharply with their wild pinnacles of rock and embatted crests…'

চায়ের পালা শেষ হতে প্রায় আধঘণ্টা লেগে গেল। সকাল আটটায় বাস ছাড়ল।

সবে সকাল আটটা। কিন্তু এরই মধ্যে বেশ চড়া রোদ উঠে গেছে প্রায় প্রত্যেকেই কোট কিম্বা ফুলহাতার সোয়েটার খুলে ফেলেছি। রোদের তেজ দেখে কল্পনা করা যায় না, আমরা এগারো বারো হাজার ফুট উঁচুতে বিচরণ করেছি। শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রবোধ কুমার সান্যাল তাঁর 'উত্তর হিমালয় চরিত' বইতে লাদাখের এই প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের কথা উল্লেখ করেছেন। লিখেছেন, 'রাত্রে যেখানে তিনখানা কম্বল জড়িয়েও ঠকঠক করে কাঁপতে হয়, দিনের বেলা সেখানে রোদ্রে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে আগা গোড়া।'

প্রশস্ত উপত্যকার ওপর দিয়ে চড়াই পথ। আমরা এখন ১২,২২০ ফুট উঁচু নামিকা গিরিবর্ত্মের দিকে এগিয়ে চলেছি মুলবেখ থেকে নামিকা লা ১৫ কিলোমিটার।

উপত্যকার দুপাশে তেমনি বিচিত্রবর্ণের ও বিচিত্রগড়নের বৃক্ষহীন পাহাড়। সবুজশূন্য পাহাড় যে এমন অপরূপ হতে পারে তা লাদাখ না এলে জানা হত না। আমি তাই দেখি, দুচোখ ভরে

দেখি আর ভাবি। ভেবে চলি এই বিচিত্র সুন্দর দেশের কথা—

সর্বকালের প্রকৃতি প্রেমিকরাই লাদাখের ডাক শুনতে পেয়েছেন। দুঃসাহসীরা সকল বাধা উপেক্ষা করে ছুটে এসেছেন এই চাঁদের দেশে। কিছুক্ষণ আগে আমি তাঁদের কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলেছি। কিন্তু আরও অনেকে আছেন। তাঁদের কথা বলা হল না।

না হোক আমি তাঁদের মতো অভিযাত্রী কিম্বা গবেষক নই। আমি একজন নিতান্তই সাধারণ পর্যটক মাত্র। কলের গাড়িতে সওয়ার হয়ে লাদাখ দেখতে এসেছি। সুতরাং সেই দুঃখজয়ী দুর্গমযাত্রীদের কথা আর নয়। তার চেয়ে একালের লাদাখের কথা ভাবা যাক।

সাতচল্লিশ সালের পাকিস্তানী হানার পর থেকে পর্যটকদের জন্য লাদাখের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। সরকার সবে যখন এই পথ খুলে দেবার কথা ভাবছিলেন, তখুনি (১৯৬২) আবার ঘটল চীনা আক্রমণ।

ভাইয়ের মুখোস পরে সরল ভারতকে ভুলিয়ে রেখে সাম্য-বাদীরা পেছন থেকে ছুরি মারল আমাদের, আর তাই অপ্রস্তুত ভারতকে হারাতে হল আকসাই চীন- মুজতাগ-কারাকোরামের পূর্বদিক থেকে কুয়েনলান পর্বতশ্রেণীর পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত– প্রায় ৩৭,৫৫৫ বর্গ কিলোমিটার।

একে জনবসতিহীন দুর্গম উঁচু পাহাড়ী অঞ্চল, তার ওপরে বন্ধুরাষ্ট্র সুতরাং সেখানে আমাদের সীমান্তরক্ষার সামান্য ব্যবস্থাই ছিল। ফলে সাম্যবাদী অগ্রাসীদের এই পররাজ্য গ্রাস পর্বটি সমাধা করতে কোনো বেগ পেতে হয় নি।

যাক্ গে যেকথা বলছিলাম ১৯৬২ সালের চীনা অনুপ্রবেশের পরে ১৯৬৫ ও ১৯৭১ সালের পাকিস্তানী আক্রমণ। প্রতিবারই

লাদাখ সীমান্তে হামলা হয়েছে। আর তাই সরকার পর্যটকদের জন্য লাদাখের দরজা খুলে দিতে পারেন নি। অবশেষে ১৯৭৪ সালে সেই বিধিনিষেধ তুলে দেওয়া হয়েছে।

পর্যটকদের জন্য এই পথ খুলে দেবার পরে প্রথম যে বিদেশী পর্যটকরা লাদাখে আসেন, তাঁরা দুজনেই জাপানী পর্বতারোহী। তাঁদের নাম মাসাহিরো ইয়ামাদা এবং মাসাতো ওকি।

তারপর থেকে প্রতিবছর লাদাখে বিদেশী পর্যটকদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। আমাদের এই বাসখানিতেও অর্ধেকের বেশি বিদেশী যাত্রী তাঁরা ইংলণ্ড জার্মানী ও বেলজিয়াম থেকে এসেছেন। তাঁদের মধ্যে যেমন ছাত্র ছাত্রী আছেন, তেমনি অধ্যাপক আছেন। রয়েছেন অবসর প্রাপ্ত বৃদ্ধ-বৃদ্ধা।

এর কারণ লাদাখ শুধু সুন্দর নয়, সে পরম বৈচিত্র্যময় এবং আজও তার বুকে বৌদ্ধ সংস্কৃতির সুপ্রাচীন ধারা অক্ষয় হয়ে আছে। আর তাই লাদাখ একটি বিশ্ববিখ্যাত বিচিত্র সুন্দর ও পবিত্র প্রদেশ।

আমার ভাবনা থেমে যায়। বাস থেমে গেছে। কি ব্যাপার?

কণ্ডাক্টর উত্তর দেয়—রাস্তা সারানো হচ্ছে। পথ বন্ধ।

সে নেমে যায় গাড়ি থেকে। ফিরে আসে একটু বাদে। গম্ভীর স্বরে বলে—দেরি হবে। আপনারা নিচে নেমে আরাম করতে পারেন।

'আরাম হারাম হ্যায়'। কিন্তু যেখানে বসে থাকার চেয়ে হেঁটে বেড়ানো বেশি আরামদায়ক সেখানে আরাম করায় কারও বোধকরি আপত্তি থাকা উচিত নয়।

অতএব নেমে আসি বাস থেকে। আমি একা নয়, আমার সঙ্গে অনেকে। লক্ষ্যহীনভাবে পথের পাশে পায়চারি করি আর চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখি। জ্ঞান হবার পর থেকে

এতকাল ধরে আমার যে পরিচিত ভারতকে দেখে এসেছি, তার সঙ্গে এর কোনো মিল নেই। থাকবে কেমন করে? এযে আর্যাবর্ত নয়, হিমালয় নয়, হিমালয় পারে লাদাখ। ভারত এখানে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত প্রসারিত।

আমি মরুভূমি সদৃশ একটি বালিময় উপত্যকায় পায়চারি করছি। বালিগুলি রৌদ্রদগ্ধ সোনালী প্রস্তরভস্মের মতো। উপত্যকাটি অবিকল মালভূমি এ যেন এক যাদুকরের দেশ। এদেশে সর্বদা উদ্ধত পবনের মাতামাতি।

মনে হচ্ছে অপরিচিত এই যাদুকরের দেশের সঙ্গে আমার পরিচিতি পৃথিবীর একমাত্র যোগাযোগ এই কালো পাহাড়ী পথটি। যে পথ আমাকে এই অজানা জগতে নিয়ে এসেছে, যে পথ আমাকে অপরিচিত লাদাখের অন্তরলোকে নিয়ে চলেছে। যে পথ বন্ধ বলে আমি এই যাদুকরের দেশে দাঁড়িয়ে রয়েছি।

যতদূর দৃষ্টি চলে শুধু পাহাড় আর পাহাড়। সেই ভিন্ন ভিন্ন রঙের বিভিন্ন গড়নের অসংখ্য পাহাড়। ঐ পাহাড় এবং এই পথ ছাড়া আর কিছু নেই এখানে। গাছপালা পশু পাখি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। এই তৃণহীন প্রাণীশূন্য তপ্তশীতল রঙিন প্রকৃতির জন্যই পুলকিত পর্যটকরা লাদাখের নাম রেখেছেন চাঁদের দেশ, আমারও তাই মনে হচ্ছে। আমি যেন সত্যই চাঁদের দেশে এসে উপস্থিত হয়েছি।

একঘণ্টা পরে বেলা দশটায় পথ মুক্ত হল, বাস ছাড়ল। আমরা আবার এগিয়ে চললাম।

ওয়াখা নদী এখনও রয়েছে আমাদের সঙ্গে। থাকবেই তো! আমাকে যে তার পৌঁছে দিতে হবে সিন্ধুনদের তীরে। আমরা সিন্ধুহীন হিন্দুস্তানের হিন্দু। এতকাল ধরে আমি তাই শুধু সিন্ধুর স্বপ্ন দেখেছি। আজ সেই সিন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে আমার।

আমি স্বপ্ন-সিন্ধু সন্দর্শনে চলেছি।

নদীর ওপারে তেমনি পাহাড়। একটির পর একটি রঙীন পাহাড়। কোনটি লাল কোনটি হলুদ কোনটি বেগুনী কোনটি ধূসর কোনটি কালো আবার কোনটিতে কালোর ওপরে সাদা সাদা ছাপ। শুধু রঙের বাহার নয়, সেই সঙ্গে গড়নের বৈচিত্র। দূরের পাহাড়গুলোকে মনে হচ্ছে ঢেউ খেলানো আলপনা আর কাছের-গুলি যেন জীবন্ত জলছবি।

এই রং আর গড়নের বৈচিত্র্যই পাহাড়ী লাদাখের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আমরা সকাল থেকেই দুচোখ ভরে দেখছি, দেখতে দেখতে পথ চলেছি।

একটা পুল পেরিয়ে নদীর ডান তীরে এলাম। নদী আমাদের উল্টো দিকে বইছে। ওয়াখা সিন্ধুনদের শাখানদী তার মানে সে যেখান থেকে এসেছে। আমরা সেখানে চলেছি।

নামিকা গিরিবর্ত্মে উঠে এলাম। গিরিবর্ত্মের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলেছি অক্লেশে। কণ্ডাক্টর না বলে দিলে বুঝতেই পারতাম না এটা কোনো গিরিবর্ত্ম এবং এর উচ্চতা ১২,২২০ ফুট। চারিদিকে কোথাও এক ফোঁটা বরফ দেখতে পাচ্ছি না। গিরি-বর্ত্মের ওপর অক্ষত ও মসৃণ ঝক্ ঝকে পথ। প্রকৃতির কি বিচিত্র লীলা।

শ্রীনগর থেকে নামিকা লা ২৫৯ কিলোমিটার আর কার্গিল এখান থেকে ৫৬ কিলোমিটার। এখন বেলা এগারোটা। তার মানে এই পথটুকু আসতে সওয়া পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগল এর মধ্যে অবশ্যি ঘণ্টা দেড়েক সময় নষ্ট হয়েছে। তাহলেও ... দেরি হওয়া উচিৎ ছিল না।

কণ্ডাক্টর জবাবদিহি করে ফাতু লা পেরোবার প... বাস রকেটের মতো ছুটবে।

দেখা যাক। কিন্তু দূরত্বের কথা মনে পড়লে স্বভাবতই আশ্বস্ত হতে পারি না। লে এখনও ১৭৫ কিলোমিটার।

কাংরাল গ্রাম ছাড়িয়ে এলাম। কয়েকখানি ঘর আর কয়েক-ফালি জমি নিয়ে ছোট গ্রাম। এখান থেকে বাঁদিকে একটি কাঁচা-পথ চলে গেল—স্টাক্‌চে, সামরা, চিক্‌তান, সিহাকার ও সান্‌জার গ্রামে। চিরতানে একটি প্রাচীন প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ রয়েছে।

নদীর তীরে তীরে পথ। এই উপত্যকার প্রধান জনপদ বোধ-খারবু। আমরা এখন সেখানেই চলেছি।

বোধ-খারবু এসে গেল কিন্তু বাস থামলো না। বরং সমতল পেয়ে ড্রাইভার গাড়ির গতিবেগ বাড়িয়ে দিল। বোধকরি রকেট হবার চেষ্টা চলেছে। আমরা তারই মধ্যে জানলা দিয়ে দেখে নিচ্ছি জায়গাটা।

বেশ বড় উপত্যকা। গাছপালা ক্ষেতখামার ঘর বাড়ি আর পথের পাশে কয়েকটা দোকান। একটা বড় বাড়ি দেখিয়ে জনৈক সহযাত্রী বলে ওটা নির্মাণ বিভাগের বিশ্রাম ভবন। ওখানে পর্যটকদের জন্য দুখানি ঘর নির্দ্দিষ্ট করা আছে।

'তার মানে আমরা ইচ্ছে করলে এখান থেকে যেতে পারি।'

'না, আগের থেকে ঘর রিজার্ভ করতে হয়।'

'কেন খুব ভিড় বুঝি ?'

'হ্যাঁ। এখানে উন্নয়নের কাজ চলেছে। সারা গ্রীষ্মকালে তাই নানা কাজে এখানে বাইরের লোক আসা যাওয়া করেন।'

বোধ-খারবু কার্গিল থেকে ৭১ কিলোমিটার। গত পনেরো মিনিটে আমরা ১৫ কিলোমিটার পথ এসেছি। এইভাবে চললে আর রকেট হতে বাকী কি ? এবং তাহলে আমরা সন্ধ্যার আগেই লে পৌঁছে যাবো।

কিন্তু আবার যে চড়াই শুরু হল ! তাই তো হবে। এবারে

আমাদের ফাতু লা পার হবার পালা। ১৩,৪৭৯ ফুট উঁচু সেই গিরিবর্ত্মটি এ পথের উচ্চতম স্থান।

এখান থেকে ফাতু লা ২১ কিলোমিটার। আর ফাতু লা থেকে 'লে' ১৩৯ কিলোমিটার। দূরত্বের কথা ভাবলেই বুকটা কেঁপে ওঠে।

কিন্তু আমার তো এমন আতঙ্কিত হওয়া উচিত নয়। দূর আর দুর্গম বলেই তো আমি এপথে এসেছি। অজানাকে জানা আর দূরকে নিকট করার জন্যই যে আমার এই লাদাখের পথে আসা। সে তো আর দূরে নয়। আমি যে লাদাখে পৌঁছে গিয়েছি। তাকে দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছি। চলেছি আমার শৈশবের স্বপ্নধারা মহাসিন্ধুর কাছে।

আমি সিন্ধুনদের তীরে তীরে পদচারণা করব। আমি মনমরা হয়ে পড়ব কেন? তাছাড়া সংসারে যে কোনপথই অন্তহীন নয়। এতটা পথ যখন পেরিয়ে এসেছি, তখন বাকি পথটুকুও যাবে ফুরিয়ে।

শার্গোল পৌঁছবার পর থেকেই মাঝে মাঝে পথের ধারে দোকান-পাটে ক্ষেতে-খামারে নারী পুরুষ দেখতে পাচ্ছি। আগেই বলছি—কার্গিল লাদাখে হলেও লাদাখী বলতে আমরা যাঁদের বুঝি, তাঁরা কার্গিলের বাসিন্দা নন। লাদাখী বলতে আমরা বুঝি লাদাখের প্রাচীন অধিবাসী। এঁরা সকলেই বৌদ্ধ। লাদাখের বৈচিত্র্যময় প্রকৃতির মতই বিচিত্র এঁদের পোশাক। ছেলেরা সরু পায়জামা ও লম্বা আলখাল্লা পরেন, পায়ে চামড়ার জুতো ও মাথায় টুপি। এই টুপিটাই দেখবার মতো। মেয়েদের পোষাকও অনেকটা ছেলেদের মতই। তবে তাদের গায়ের জামাটি কিঞ্চিৎ ছোট এবং হাল্কা। সেটির ওপরে তারা একটি রঙীন জ্যাকেট গায়ে দেন আর পিঠের সঙ্গে হরিণ কিম্বা অন্য কোনো জন্তুর

একখানি সুবিরাট চামড়া ঝুলিয়ে নেন। হাতে পায়ে গলায় ও কোমরে নানা রঙের পাথর কড়ি ও ধাতুর গয়না পরেন। তাঁদের চুল বাঁধাটাও দেখবার মতো। তবে সব চেয়ে দর্শনীয় হল টুপিটি।

আজকাল অবশ্য শুনেছি, শহরবাসী ছেলেরা অধিকাংশ প্যান্ট কোট পরছেন আর মেয়েরাও স্কার্ট কিম্বা শাড়ী পরতে শুরু করেছেন। তবে এসব আধুনিক পোশাক গ্রামাঞ্চলে খুব কমই দেখা যায়।

বর্তমান ভারতে সবচেয়ে বড় সমস্যা জনসংখ্যা বৃদ্ধি। লাদাখে কিন্তু এই সমস্যাটি নেই বললে চলে। চল্লিশ হাজার বর্গমাইল বিস্তৃত ভূখণ্ডের জনসংখ্যা মাত্র এক লক্ষের কিছু বেশি। এবং এই সংখ্যাটি শ' খানেক বছর ধরে প্রায় একই রয়ে গিয়েছে। এর প্রধান কারণ বহুপতি প্রথা। এবং প্রতি পরিবারের অন্তত একজনের বিয়ে না করে গুমফায় চলে যাওয়া। তাই লাদাখে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা নেই।

॥ তিন ॥

আমরা লাদাখ জেলার মধ্যাঞ্চল দিয়ে পূর্ব প্রান্ত থেকে প্রায় পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করছি—গতকাল জোজি লা থেকে কার্গিল এসেছি, আজ কার্গিল থেকে লে চলেছি। পরে আরও পশ্চিমে এগিয়ে 'তিক্সে' ও 'শে' গুম্ফা দেখে হেমিস গুম্ফায় পৌঁছাব। আগামীকাল থেকে সেখানে উৎসব শুরু হবে। মুখোশ নৃত্যের আসর বসবে।

এই অংশটাই মূল লাদাখ ভূখণ্ড। কয়েকটা নদী দিয়ে বিধৌত এই অঞ্চল। নদীর উপত্যকাগুলি লাদাখ জেলার এক একটি বিভাগ। শুধু প্রাকৃতিক নয়, শাসনতান্ত্রিক বিভাগও বটে। কাশ্মীরের ডোগরা সেনাপতি জরোয়ার সিং ১৮৪২ সালে লাদাখ

জয়ের পরে এই উপত্যকাগুলিকেই পরগণা রূপে স্থির করেছিলেন। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য আজও সে বিভাগ অক্ষুণ্ণ আছে।

এই বিভাগ প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে পড়ছে নুবরা উপত্যকার কথা। এটি নুবরা এবং শিয়োক নদী বিধৌত অঞ্চল অর্থাৎ লাদাখ জেলার পশ্চিমাংশ। এই উপত্যকার ওপর দিয়েই সেকালে ছিল মধ্য এশিয়ার বাণিজ্য পথ—ইয়ারখন্দ থেকে আর্যাবর্তের পথ।

উত্তর পূর্ব্বাংশ ছাড়া এই উপত্যকার অধিকাংশ অঞ্চল অপেক্ষাকৃত উষ্ণ এবং উর্বর। ওখানে আপেল আঙ্গুর খুবানি প্রভৃতি ফল জন্মায়।

নুবরা উপত্যকার উত্তর পূর্বাংশই আকসাই চীন। সেখানকার উচ্চতা ষোলো থেকে সতেরো হাজার ফুট। মনুষ্য বসতিহীন এই অজন্মা অঞ্চলটার কিন্তু ভারতের নিরাপত্তা রক্ষায় অসাধারণ গুরুত্ব ছিল। আগেই বলেছি বাষট্টি সালে এই অঞ্চলটি চীনরা দখল করে নিয়েছে। আর তারই ফলে তারা পাকিস্তানের সঙ্গে সোজাসুজি সড়ক যোগাযোগ করে নিতে পেরেছে।

দ্বিতীয় বিভাগটি হল সিন্ধু উপত্যকা। এটি লাদাখের মধ্যঞ্চলে এবং সবচেয়ে জনবসতিপূর্ণ উর্বর অংশ। লাদাখ বললে আমরা সাধারণতঃ এই অঞ্চলটিকেই বুঝে থাকি। এর আয়তন চার হাজার বর্গমাইল। আমরা লাদাখ পরিক্রমা এই অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ।

তৃতীয় বিভাগটির নাম জাঁসকার উপত্যকা। তখন কার্গিলে বসে আমি এই অংশের কথা কিছু বলেছি। অঞ্চলটি লে শহরের দক্ষিণ পূর্ব দিকে অবস্থিত। এটি জাঁসকার নদীর উপত্যকা। আয়তন তিন হাজার বর্গমাইল। তবে অধিকাংশই পর্বতশৃঙ্গ ও হিমবাহে পরিপূর্ণ। এই অঞ্চলের গড় উচ্চতা ১৩,১৫৪ ফুট।

রুপ্‌সু অথবা রুক্‌সু উপত্যকা লাদাখের চতুর্থ প্রাকৃতিক

বিভাগ। এই অঞ্চলের অধিবাসীদের বলা হয় খাম্পা। উপত্যকায় গড় দৈর্ঘ ও প্রস্থ যথাক্রমে ৯২ ও ৬২ মাইল, আয়তন প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বর্গমাইল। সর্বনিম্ন উচ্চতা ১৩,৫০০ ফুট। চারি পাশের পর্বতশ্রেণীতে ২০/২১ হাজার ফুট উঁচু পর্বতশৃঙ্গ রয়েছে। গাছপালা প্রায় হয় না বললেই চলে। আকসাই চীনের মতো এ উপত্যকারও লবণহ্রদ রয়েছে।

লাদাখের শেষ বিভাগটি দ্রাস পুরিগ সুরু উপত্যকা। গতকাল বিকেলে এবং আজ সকালে আমরা এই উপত্যকাটি অতিক্রম করে এসেছি। এই অঞ্চলের আয়তন ৪২০০ বর্গমাইলের মতো।

বিগত শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত লাহুল ও স্পিতি উপত্যকা লাদাখের অংশ ছিল। ১৮৪৬ সালে কাশ্মীরের মহারাজা গুলাব সিং বন্ধুত্বের বিনিময়ে ঐ উপত্যকা দুটিকে বৃটিশদের দিয়ে দেন। তাঁরা লাদাখের ঐ অংশকে পাঞ্জাবের সঙ্গে যুক্ত করে নেন। বর্তমানে লাহুল স্পিতি নবগঠিত হিমাচল প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত।

লাদাখ একটি পর্বতময় ভূখণ্ড অবস্থান ৩৫° ৪৫′ থেকে ৩৫° ৫০′ উত্তর অক্ষরেখা এবং ৭৫° ৪৫′ থেকে ৮৩° ৩০′ পূর্বদ্রাঘিমায়। এই জেলায় পর্বতশ্রেণী দক্ষিণ পূর্ব থেকে উত্তর পশ্চিমে বিস্তৃত এবং সমান্তরাল ভাবে অবস্থিত। ফলে উপত্যকার ওপর দিয়ে নদীগুলিও একইদিকে প্রবাহিত। লাদাখের প্রধান নদী সিন্ধু। কিন্তু সিন্ধুর কথা পরে হবে। আগে অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নদী গুলির কথা ভেবে নিই।

অন্যান্য নদীর প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে পড়ছে শিয়োক নদীর কথা। এটি সিন্ধুনদের পশ্চিম উপনদী। লে শহরের উত্তরে কারাকোরাম পর্বতশ্রেণী থেকে উৎপন্ন হয়ে কিরিস নামে একটা জায়গায় এসে সিন্ধুতে পড়েছে। নদীটির দৈর্ঘ্য ৪০০ মাইল।

নুব্রা নদী শিয়োকের উপনদী। আকসাইচীন হিমবাহ থেকে

উৎপন্ন হয়ে দক্ষিণ পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে লোকুঝঙ গ্রামের কাছে এসে শিয়োকের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। নদীটি প্রায় ১০০ মাইল দীর্ঘ। জাঁসকার নদী সিন্ধুনদের একটি প্রধান উপনদী। এটি ছুটি নদীর মিলিত ধারা—জাঁসকার ও সুমগাল। লাদাখ ও লাহুলের সীমারেখায় অবস্থিত বারালাচা গিরিবর্ত্ম থেকে উৎপন্ন হয়ে জাঁসকার পর্বত শ্রেণীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এসে সিন্ধুর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। নদীটির দৈর্ঘ্য ২৩০ মাইল। এই নদীপথ ধরেই লাদাখ থেকে লাহুলের পথ। ইদানিং এটিকে মোটর পথে উন্নীত করা হয়েছে। এই পথে ৫১০০ মিটার উঁচু শিঙ্গো লা পেরোতে হয়। আর তাই কেবল গ্রীষ্ম-কালে মোটর চলতে পারে। বিশেষ অনুমতি ছাড়া এপথে যাওয়া যায় না এবং এখনও এপথে যাত্রীবাহী বাস চলে না। তবে অনুমতি নিয়ে নিজেদের গাড়ীতে কিম্বা পায়ে হেঁটে যাওয়া যায়। পান্দুই থেকে মানালী পৌঁছতে দিন সাতেক হাঁটতে হয়।

এবারে সিন্ধুর কথা ভাবা যাক। তার কথা যে ভাবতেই হবে আমাকে। আমার এই লাদাখে আসার অন্যতম প্রধান কারণ তাকে দেখা। এবং আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি সিন্ধু উপত্যকায় উপনীত হব।

লাদখের প্রধান নদী সিন্ধু। সিন্ধু একটি সংস্কৃত শব্দ, অর্থ সমুদ্র অর্থাৎ মহাসিন্ধু মানে মহাসমুদ্র।

পশ্চিম তিব্বতে এই নদীর নাম 'সিন্‌হ খা বাব' অর্থাৎ যে নদী সিংহের মুখ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। আর এই নদীর লাদাখী নাম 'সিংগে চু' লাদাখে নদীকে বলে 'চু'।

সিন্ধু নদ ভারতবর্ষের পবিত্রতম প্রাচীনতম ও বৃহত্তম নদী গুলি অন্যতম। বর্তমানে ভারতে লাদাখ ছাড়া আর কোথাও সিন্ধু নেই। সিন্ধুর বাকি অংশ তিব্বত ও পাকিস্তানে।

৩২° উত্তর অক্ষরেখা এবং ৮১° পূর্ব দ্রাঘিমায় মানস সরোবরের কাছে কৈলাস পর্বতের উত্তরাংশ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। ভারতের আগে সিন্ধু সৃষ্ট হয়েছে। ঐ একই অঞ্চল থেকে দুটি মহানদী— শতদ্রু আর ব্রহ্মপুত্র। কিন্তু তাদের কথা থাক, সিন্ধুর কথাতেই ফিরে আসা যাক।

সিন্ধু নদের উৎসের উচ্চতা প্রায় সতেরো হাজার ফুট। উৎস থেকে সিন্ধু উত্তর পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে 'ঘর' নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। তার পরে তিব্বত থেকে প্রবেশ করেছে ভারতের লাদাখে। নেমে এসেছে তেরো চোদ্দ হাজার ফুটে। লাদাখেও সিন্ধু মোটামুটিভাবে উত্তর পশ্চিমে প্রবাহিত।

'লে' শহর ছাড়িয়ে আসার পরে বাঁদিক থেকে জাঁসকার নদী এসে সিন্ধুকে সমৃদ্ধ করেছে। কার্গিলের কাছে ঐ একই তীরে দ্রাস ও সুরু নদীর মিলিতধারা সিন্ধুর সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

লাদাখ থেকে সিন্ধু বাল্টিস্তানে প্রবেশ করেছে। প্রবাহিত হয়েছে সেই প্রায় একই উত্তর পশ্চিম দিকে। স্কার্দু পৌঁছবার কিছু আগে নুবরা ও শিয়োকের মিলিত ধারা ডানদিক থেকে মহাসিন্ধুর মাঝে বিলীন হয়েছে।

স্কার্দু পেরিয়ে সিন্ধু গিলগিটের সমতলে অবতরণ করে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বাঁক নিয়েছে। অবশেষে সিন্ধু পাকিস্তানে প্রবেশ করে দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ সমুদ্রের উদ্দেশে তার যাত্রা করেছে শুরু।

কৈলাস থেকে আরব সাগরে সিন্ধুর সঙ্গম ১৮০০ মাইলের মতো। এর অর্ধেকের বেশি পাকিস্তানে তার পাকিস্তানে যাত্রাপথে আটক শহরের কাছে কাবুল নদী এবং মিঠানকোটের কাছে পাঞ্জাবের পঞ্চনদী তথা ঝিলম চন্দ্রভাগা ইরাবতী বিপাশা শতদ্রুর মিলিত-ধারা বাঁদিক থেকে এসে সিন্ধুকে সমৃদ্ধ করেছে। মিঠানকোটের উচ্চতা মাত্র ২৬০ ফুট। অবশেষে করাচীর কাছে পৌঁছে সিন্ধু তার

১৯০০ মাইল পথপরিক্রমা করে আরব সাগরে বিলীন হয়েছে। এই নদীর প্রবাহপথে অধিকাংশ স্থান জুড়ে রয়েছে পশ্চিম পাঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশ। বাক্কুরের পর থেকেই সিন্ধু নামটি সুপ্রচলিত। সিন্ধুর বদ্বীপের আয়তন ৩০০০ বর্গমাইল এবং সিন্ধু ৩,৭২,৭০০ বর্গমাইল এলাকাকে জলসিক্ত করেছে।

হরাপ্পা ও মহেঞ্জোদারো আবিস্কৃত হবার পরে বিশ্বের ইতিহাসে সিন্ধু সভ্যতা একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। বঙ্গগৌরব রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় ১৯২২ সালে একটি বৌদ্ধস্তুপের নিচে মহেঞ্জদারো আবিস্কার করেন। তিনি প্রমাণ করে গিয়েছেন তৎকালীন সিন্ধুসভ্যতা অত্যন্ত উন্নীত এবং সুবিস্তৃত ছিল।

যে নদীকে অবলম্বন করে সেই সুপ্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, একটু বাদে আমি সেই সিন্ধুনদের তীরে উপস্থিত হবার সৌভাগ্য অর্জন করব। আজ আমার বহু বছরের বাসনা পূর্ণ হবে। আমার হিন্দুজন্ম সার্থক হবে।

মহাসিন্ধু বিধৌত মহান লাদাখ তোমাকে নমস্কার। হে মহামতি মহাসিন্ধু, তুমি এই গাঙ্গেয় পথিকের প্রাণের প্রণতি গ্রহণ করো।

## ॥ চার ॥

দেখতে দেখতে আমরা ফাতু গিরিবর্ত্মের উঠে এলাম। ১৩,৪৭৯´ ফুট উঁচু ফাতু লা শ্রীনগর লে রোডের উচ্চতম স্থান। কিন্তু একে মোটেই গিরিবর্ত্ম বলে মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে ময়দানের ওপর দিয়ে বাস চলেছে। চারিদিকে প্রখর রোদ। হাওয়া না থাকলে বোধকরি গরম লাগত দক্ষিণদিকে দুটি তুষারাবৃত পর্ব্বতশৃঙ্গ দেখা যাচ্ছে। ওরাই বোধ হয় নুন এবং কুন শৃঙ্গ লাদাখ পর্বত শ্রেণীর দুটি বিখ্যাত পর্বত শিখর।

গিরিবর্ত্মের ওপরে গাড়ি থামল না, এগিয়ে চলল। একটু বাদেই নামতে শুরু করলাম। আঁকাবাঁকা পথে আমরা নিচের সবুজ উপত্যকার দিকে ছুটে চলেছি। জনৈক সহযাত্রী বলে ওঠে ওটা লামায়ুরু।

লামায়ুরু পৌঁছন গেল। তার মানে শ্রীনগর থেকে ৩১০ কিলোমিটার এলাম। আরও ১২৪ কিলোমিটার যেতে হবে। এখন বেলা বারোটা বেজে বিশ।

সিন্ধুর সঙ্গে দেখা হয় নি এখনও কিন্তু আমরা সিন্ধু উপত্যকায় পৌঁছে গিয়েছি। এখান থেকেই প্রকৃতপক্ষে সিন্ধু উপত্যকা আরম্ভ হয়ে গেল।

পথের ডানদিকে খানিকটা দূরে ছোট একটি পাহাড়ের উপর লামায়ুরু বা লামাগুরু গুম্ফা দেখা যাচ্ছে। এটি লাদাখের প্রাচীনতম গুম্ফা।

শুনেছি এই গুম্ফার সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শন একাদশ শিব এবং এক-হাজার চক্ষু সমৃদ্ধ চ্যানরাজিক। এই মূর্তিগুলি নাকি অবিস্মরণীয় কিন্তু আমাদের ভাগ্য মন্দ। আমরা এ গুম্ফা দর্শন করতে পারলাম না।

গুম্ফাটি মূল-পথ থেকে দূরে নয়, কিন্তু দর্শন করতে হলে বাসটিকে কিছুক্ষণ দাঁড়াতে হবে। ড্রাইভার কিছুতেই রাজী হল না। এমনকি জন প্রতি পাঁচটাকা বাড়তি ভাড়ার লোভ দেখিয়েও তার মন গলানো গেল না।

অতএব অপলক নয়নে তাকিয়ে থাকি প্রাচীন দেবালয়ের দিকে। চলমান বাসে বসে ভাবতে থাকি—লামায়ুরু কেবল লাদাখের প্রাচীনতম গুম্ফা নয়, বর্তমান লাদাখের একমাত্র প্রাচীন গুম্ফা। উনবিংশ শতাব্দীর ডোগরা আক্রমণের সময় লাদাখের প্রায় সমস্ত বড় গুম্ফা ধ্বংস হয়ে যায় তখন নাকি

গুম্ফাগুলি দুর্গে রূপান্তরিত হয়েছিল। আর তাই ধ্বংস হয়ে যায়। তাহলেও ডোগরা সেনাপতি জরোয়ার সিংকে আমি নির্দোষ বলতে পারছি না। কারণ হিন্দুজাতির ইতিহাসে ধর্মস্থান ধ্বংস করার নজির প্রায় নেই বললেই চলে।

যেভাবেই হোক, লামায়ুরু গুম্ফাটি মূল পথের প্রায় পাশে অবস্থিত হয়েও অক্ষত রয়ে গিয়েছে। আর তাই আজ এটি প্রাচীন লাদাখের প্রাচীন ও পবিত্র স্মৃতি রূপে সমাদৃত।

পাহাড়ের গা বেয়ে পথটা নেমে এলো উপত্যকায়। বাস ছুটে চলল উর্বরা উপত্যকার উপর দিয়ে। পথের পাশে বাড়ি-ঘর আর ক্ষেত-খামার, তারপরে পাহাড়। সেই পাহাড়ের ওপরে গুম্ফা। এই উপত্যকার নাম দ্রোগ পো।

সেকালের যাত্রীদের সৌভাগ্যের কথা ভেবে ঈর্ষা না করে পারছি না। তারা ঘোড়ায় চড়ে ধীরে সুস্থে পথ চলতেন। শ্রীনগর থেকে লামায়ুরু আসতে তাঁদের এগারো বারোদিন সময় লেগে যেত অনেক কষ্ট করে তাঁদের পথ চলতে হত। কিন্তু তাঁরা পথের যাবতীয় দ্রষ্টব্য বস্তু দেখতে পেতেন।

শঙ্কুদা—, তাকিয়ে দেখুন ল্যাঙরু লুপ।

সহযাত্রীর কথায় ভাবনা হারিয়ে যায়। তাড়াতাড়ি পথের দিকে তাকাই। বিস্মিত হই। বহু বছর আগে প্রথমবার দার্জিলিং যাবার পথে বাতাসিয়া লুপ দেখে এমনি বিস্ময় ও আনন্দে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। এ কিন্তু তার চেয়েও সুন্দর। সেখানে পথটা বৃত্তাকারে একবার ঘুরেছে আর এখানে অর্ধবৃত্তাকারে বহুবার—অনেকটা ইংরেজী S অক্ষরের মতো। এঁকে বেঁকে ওপরে উঠেছে।

এক একটা বাঁক পেরিয়ে আমরা এক একটি ধাপ ওপরে উঠছি। দু-দিকেই পথের সারি। ওপরে ও নিচে একসঙ্গে পথের

বেশ কয়েকটা করে ধাপ দেখা যাচ্ছে। প্রতি ধাপে চলমান গাড়ি। গাড়িগুলো ভিন্ন ভিন্ন ধাপে ভিন্ন ভিন্ন দিকে চলেছে। পাশাপাশি দুটি ধাপে বিপরীত দিকে ছুটছে ভারী মজা লাগছে দেখতে। এগুলো যেন সত্যিকারের গাড়ি নয়। কতগুলো খেলনার মোটরকে বুঝিবা চাবি দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সেগুলো আমার দুপাশে ওপরে নিচে যথেচ্ছ ছুটোছুটি করছে।

দেরি হয়ে যাবে বলে ড্রাইভার আমাদের লামাযুরু গুম্ফা দেখায় নি। কিন্তু মারে কৃষ্ণ রাখে কে? তার তাড়াতাড়ি পৌঁছবার পরিকল্পনা সফল হল না। ল্যাণ্ডরু লুপ থেকে সমতলে নেমে আসার আগেই থামতে হল আমাদের। নিচের থেকে কন্‌ভয় আসছে এপথে কন্‌ভয় সর্বদা আগে যাবে।

প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে পৌনে দুটোর সময় কন্‌ভয় শেষ হয়ে গেল। শুরু হল অবরোহণ। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই আমরা নেমে এলাম সমতলে। তার মানে পাঁচ মিনিট আগে এলে পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় বেঁচে যেত। তবে ল্যাণ্ডরু লুপটিকে এতক্ষণ বসে দেখা হত না।

শুধু তাই নয়, লুপ থেকে নেমে আসার পরেই দেখা হল সিন্ধুর সঙ্গে। আমার শৈশব স্বপ্ন সত্য হল, হিন্দু জন্ম সার্থক হল। আমি মহাসিন্ধুকে দর্শন করি। দু হাত জোড় করে তাকে প্রণাম জানাই।

পথের পাশে পাথুরে বেলাভূমি, তারপরে স্বপ্নসিন্ধু। সে চলেছে আমার বিপরীত দিকে। গঙ্গার মতো সেও স্বর্গের অমৃতধারা বহন করে মর্তলোকে নিয়ে চলেছে। তাই সে স্বচ্ছ-সলিলা নয় গঙ্গোদকের মতই গৈরিকধারা। আমি এই কৈলাস-পুত্রের পুণ্যপ্রবাহে অবগাহন করতে পারব তার তীরে তীরে পদচারণা করতে পারব। আমি আজ ভারতীয় সভ্যতার সূতিকার

সিন্ধুনদের তীরে উপস্থিত হতে পেরেছি। আমি ধন্য।

এখানে জাস্কার গিরিশ্রেণী শেষ হয়ে গেল। এবারে আমরা লাদাখের মূল-পর্বতশ্রেণীতে প্রবেশ করব। সেখানে বেলে পাথর আর চূণা মাটি, গ্র্যানিট প্রায় নেই বললেই চলে। অর্থাৎ পুনরায় প্রকৃতির রূপ পরিবর্তন আসন্ন।

পাশ্বে নদীতীরের উৎরাই পথ বেয়ে বাস একটা পুলের ওপর এসে উঠল। এটা খালসি পুল। এই পুলটি উত্তর ও দক্ষিণ লাদাখের যোগাযোগ রক্ষা করছে। হেডিন শ্রীনগর থেকে রওনা হয়ে ত্রয়োদশ দিনে এখানে পৌঁচেছিলেন।

এই পুলের ওপর থেকে চারিদিকের দৃশ্য তাঁর বড়ই ভাল লেগেছিল আমাদেরও লাগছে। কিন্তু হেডিনের মতো দুদণ্ড দাঁড়িয়ে সিন্ধু সন্দর্শনের সময় কোথায় আমার? আমি যে সরকারী বাসের সাওয়ার হয়ে লাদাখ দর্শনে এসেছি। বাস পুলের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলল।

পুলটি পুরনো। জরোয়ার সিং নাকি এই পুলের সংস্কার সাধন করেছিলেন। তারপরে স্যার আলেকজাণ্ডার কানিংহাম লাদাখ আসেন। তিনি এবং স্বেন হেডিন তাঁদের বইতে এই পুলের উল্লেখ করেছেন। তবে তখন ছিল কাঠের ঝুলন্ত পুল আর এখন আধুনিক ব্রিজ। শুধু সিন্ধুর তেমন কোনো পরিবর্তন হয় নি। আজও সে তেমনি দুর্বার। শতাধিক বছরেও তার যৌবন জলতরঙ্গে ভাটার টান পড়েনি।

পুল পেরিয়ে আমরা সিন্ধুনদের ডানতীরে এলাম। শুরু হল সিন্ধুর তীরে তীরে পথচলা। এখন যে ক'দিন আমি লাদাখে থাকব, সিন্ধু সর্বদা সঙ্গে থাকবে আমার। আমি প্রতিদিন প্রতিপদে সিন্ধুর স্নেহস্পর্শ লাভ করব।

ডাইনে নদী, বাঁয়ে একফালি পাথরে উপত্যকা তারপরে

পাহাড়ের সারি নেড়া পাহাড়।

না, পাহাড়গুলি ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে তাদের রং ফিরছে। সবুজের ছোঁয়া লাগছে।

এখন আর একটাও নেড়া পাহাড় নেই সবই সবুজ। শুধু তাই নয় পাহাড় সরে গিয়েছে বহুদূরে। তার জায়গায় দেখা দিয়েছে একটি উর্বর উপত্যকা। ক্ষেত-খামার বাড়ী-ঘর আর দোকান পাট। আমরা খালসি গ্রামে পোঁছে গিয়েছি।

ভারী সুন্দর গ্রাম। পথের পাশে উইলো আর পপ্‌লারের সারি। তাদের কচি সবুজ পাতাগুলি বাতাসে দোলা খেতে খেতে আমাকে রূপসী বাংলার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। আমি গঙ্গা-তীর থেকে সিন্ধুতীরে এসেছি, তবু সোনার বাংলাকে বিস্মৃত হই নি। তাই লাদাখের খালসিতে এসে আমার বরিশালের গাভা গ্রামের কথা মনে পড়ছে, মনে পড়ছে ঢাকুরিয়ায় আমার ছোট্ট বাগানটির কথা।

॥ পাঁচ ॥

বেলা ঠিক দুটোর সময় খালসি বাজারে এসে বাস থামল। মধ্যাহ্ন ভোজনের বিরতি ঘটল। আজ সওয়া আটঘণ্টায় আমরা ১৩৪ কিলোমিটার এসেছি। ভালই বলতে হবে। কারণ এর মধ্যে মুলবেখে চা খাওয়া এবং পথে কনভয়ের জন্য সওয়া ঘণ্টার মতো থামতে হয়েছে। এইভাবে চলতে পারলে সন্ধ্যার বেশ আগেই আমরা লে পোঁছে যাবো। এখান থেকে লে ৯৭ কিলোমিটার আর লাদাখে রাত আটটার আগে সন্ধ্যা হয় না।

লাদাখ যাওয়া আসার পথে প্রায় সবাই এখানে এসে দুপুরের খাওয়া সেরে নেন। ফলে এখানে গড়ে উঠেছে বহু রেস্তোরঁা ও খাবারের হোটেল। এখন অবশ্য এখান থেকে কর্গিলের

একটি নূতন পথ তৈরি হচ্ছে। সেই পথে যাত্রীদের আর নামিকা লা এবং ফাতু লা পেরোতে হবে না। পথটির দূরত্ব কত হবে জানা নেই আমার। তখন কোথায় মধ্যাহ্ন ভোজনের স্থান নির্দিষ্ট হবে, তাও বলতে পারব না।

কিন্তু ভবিষ্যতের সেই ভোজনস্থলী আমাদের আলোচ্য নয়। আমরা এখানেই দুপুরের খাওয়া সেরে নেব। খুবই খিদে পেয়েছে। অতএব সবার সঙ্গে নেমে আসি বাস থেকে।

আমরা খাবার বানিয়ে এনেছি। খাবার পরিবেশনের কিছু দেরি আছে। এই অবসরে খালসি জায়গাটাকে একটু দেখে নেওয়া যাক।

পথে পায়চারি শুরু করি। বেশ ভাল লাগছে। একে অনেকক্ষণ একভাবে বসেছিলাম, এখন হেঁটে বেড়াতে বেশ আরাম লাগছে। তাব ওপরে জাযগাটিও জম জমাট। নানারঙের বিচিত্র বেশে নাবী পুরুষেব দোকানী তাদেব পসরা সাজিয়ে বসে আছেন। এ যেন এক নূতন দেশ।

পথের পাশে ছোট ডাক ও তারঘব। সামনে সুবিবাট একটা আখরোট গাছ কাশ্মীর উপত্যকা ছাড়িয়ে আসার পরে পথে আর এত বড় আখরোট গাছ দেখি নি।

আমরা দেখতে দেখতে এগিয়ে চলি। একজন বৃদ্ধ লাদাখীর সঙ্গে আলাপ হয়। তিনি মোটামুটি হিন্দী বলতে পারেন। আমরা কলকাত্তা থেকে আসছি শুনে ভদ্রলোক বেজায় খুশি। কথায় কথায় তিনি জনান—খালসিকে আমরা বলি খালাৎসে। এটি শুধু বড়গ্রাম নয়, চারিপাশের সমস্ত গ্রামের প্রাণ-কেন্দ্রও বটে।

'শঙ্কুদা, আসুন। খাবার নিয়ে যান।'

নেতার ডাক কানে আসে। খেতে ডাকছে। খুবই খিদে

পেয়েছে। তাই ভদ্রলোকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাসের কাছে ফিরে আসি।

পথের ধারে গাছের ছায়ায় একখানি বড় পাথরের ওপর খাবার সাজিয়ে রেখেছে। কাগজের থালায় লুচি তরকারী ও হালুয়া। আমরা খেতে শুরু করি।

খাবার পরে পাশের দোকানের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে সবাই চা খেয়ে নিই।

বেলা পৌনে তিনটায় বাস ছাড়ে। বাঁদিকে বাড়ি-ঘর ডানদিকে সিন্ধুনদ, একটু বাদে বাড়ি শেষ হয়ে যায়, শুরু হয় ক্ষেত। কয়েক মিনিট পরে ক্ষেতও গেল ফুরিয়ে। আর তারপরেই সবুজ উপত্যকাটি গেল হারিয়ে। সিন্ধু শুধু সঙ্গে রয়ে গেছে। তাকে তো থাকতেই হবে সঙ্গে। আমি যে তারই কাছে এসেছি। গঙ্গার তীর থেকে সিন্ধুতীরে।

উপত্যকা পেরিয়ে পথটা চড়াই হল অনেকটা ওপরে উঠে এলাম। তারপরেই আবার সমতল মালভূমির মতো সেই সমতলের বুক বেয়ে পথ। পথের ডানদিকে নদী। নদীর ওপারে পাহাড়। আর বাঁদিকে বেশ খানিকটা বালি আর কাঁকরের ভূখণ্ড। তারপরে পাহাড়।

বাস থামল। কণ্ডাক্টর বলে চেক্ পোষ্ট।

এইরে সেরেছে! এবারে নিশ্চয়ই তল্লাসীর নামে শাস্তি শুরু হবে আমাদের অনেক মালপত্র। অধিকাংশ চট দিয়ে মুড়ে সেলাই করা সেগুলো খুলে ফেললে যে খুবই মুসকিলে পড়ব।

কিন্তু না, লাদাখের পুলিশ দেখছি অতিশয় অমায়িক এবং ভদ্র। কেবল আমাদের নয়, বিদেশী বন্ধুদের পর্যন্ত তাঁরা বিশ্বাস করলেন, কাউকে বিন্দুমাত্র ব্যতিব্যস্ত না করে তাঁরা নিজেদের কর্তব্য পালন করতে থাকলেন।

সুযোগ পেয়ে গাড়ি থেকে নেমে এলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সসব্যস্ত হয়ে উঠি। না, পুলিশের নয়, লাদাখের বাতাস। গাড়ির দরজা জানালা বন্ধ তাই বাসে বাসে পবনদেবের এই উন্মত্ত আচরণ এতক্ষণ টের পাই নি। কিন্তু পথে নামতেই তিনি আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন। উন্মাদ পবনের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য তাড়াতাড়ি আবার গাড়িতে এসে আশ্রয় নিই।

তল্লাসী শেষ হয়। পুলিশ বাস থেকে নেমে যান। বাস চলতে শুরু করে। আমাদের ডানদিকে সিন্ধু, সোনার সিন্ধু। সিন্ধু ও তার উপনদীর তীরে তীরে সত্যই সোনা পাওয়া যায়। আগে লাদাখের রাজা সেই সোনা বিভিন্ন গুম্‌ফায় দান করে দিতেন।

গুম্‌ফার প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল রিজং গুম্‌ফার কথা। এরই কোনো জায়গা থেকে বোধকরি সেখানে যাবার পথ। কথাটা কণ্ডাক্টরকে জিজ্ঞেস করি।

সে উত্তর দেয়—ঐ যে বাঁদিকে রিজঙের পথ।

একটু বাদেই বাস সেখানে আসে। পথটাকে ভাল করে দেখি—মাটির মোটরপথ।

এবারে নেতা কথা বলে আমরা খালসি থেকে ২৬ কিলোমিটার এসেছি। এ জায়গাটার নাম উলে-টোক্‌নো।

মনে মনে রিজং গুম্‌ফার কথা ভাবা যাক। একটু আগে আগে আমরা যে পথটি ছাড়িয়ে এলাম, সেই পথ দিয়ে মিনিট দশেক হেঁটে গেলেই একটি নদী পাওয়া যাবে। পুলের ওপর, দিয়ে নদী পার হতে হবে। তারপরে ডানদিকের পথ ধরে ঘন্টাখানেক হাঁটলে একটা খুবানি বাগানে পৌঁছব, জায়গাটার নাম জুলিচেন। সেখানে রিজং গুম্‌ফার সন্ন্যাসিনীদের জন্য একটা আশ্রম আছে।

জুলিচেন থেকে প্রায় আধঘণ্টা হেঁটে দেখব পথটা ঢালু হয়ে উপত্যকার অপেক্ষাকৃত উর্বর অংশে প্রসারিত হয়েছে। আর সেখানেই দক্ষিণ দিকে পাহাড়ের পাদদেশে গুম্‌ফা। উচ্চতা ৩৪৫০ মিটার।

১৮২৯ সালে গুম্‌ফাটি নির্মিত হয়েছে এখন জন তিরিশেক লামা স্থায়ীভাবে গুম্‌ফায় বাস করেন। মানালী ও ধর্মশালার লামা হচ্ছেন রিজঙের প্রধান লামা। এখন অবশ্য প্রধান লামা নিজেই ধর্মশালায় থাকেন। তিব্বত থেকে পালিয়ে আসার পরে দালাইলামা ধর্মশালাকেই তার প্রধান কর্মকেন্দ্র রূপে নির্বাচিত করেছেন।

রিজং গুম্‌ফায় মূল-মন্দিরটি সত্যিই দেখার মতো। তারপরেই দেখতে হবে পাথরের প্রার্থনা ঢোলটি। পাথর হলেও সেই ঢোলের শব্দ বহুদূর থেকে শোনা যায়। সেই শব্দের ধ্বনি আর প্রতি-ধ্বনিতে প্রতিদিন লাদাখের ঘুমন্ত প্রকৃতি জেগে উঠে ভক্তদের সঙ্গে বুদ্ধের জয়গানে যোগ দেয়।

এই বাসপথ থেকে রিজং গুম্‌ফা ৬ কিলোমিটার। অদূর ভবিষ্যতে নাকি রিজং পর্যন্ত মোটরপথ প্রসারিত হবে। তখন লাদাখ দর্শনার্থীদের আর আমার মতো বাসে বাসে রিজং গুম্‌ফার কথা ভাবতে হবে না। 'লে' যাতায়াতের পথে তাঁরা গুম্‌ফাটি দেখে নিতে পারবেন।

বাস এগিয়ে চলেছে। সাসপোল বোধকরি আর দূরে নয়। খালসি থেকে সাসপোল ৩৫ কিলোমিটার। তার মধ্যে আমরা অন্তত তিরিশ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে এসেছি। তাহলে এবার কণ্ডাক্টরকে আলচি গুম্‌ফার পথটির কথা জিজ্ঞেস করা যেতে পারে। গুম্‌ফা তো দেখা হবে না, গুম্‌ফায় যাবার পথটিকে অন্তত দেখে নেওয়া যাক।

আমার প্রশ্ন শুনে কণ্ডাক্টর মাথা নাড়ে। বলে—হ্যাঁ। খালসি থেকে ৩৩ কিলোমিটার পরে আলচির পথ। এই এসে গেল বলে। আমি দেখিয়ে দেব।

শুনেছি সিন্ধুর ওপারে এক বিস্তৃত উপত্যকায় আলচি গ্রাম। সেখানেই একাদশ শতাব্দীর সেই সুপ্রাচীন গুম্ফা। কিন্তু সেটিও আক্রমণকারীদের হাতে ক্ষত বিক্ষত হয় নি। কারণ গ্রামটি লে শ্রীনগর পথের ওপরে নয় এবং অন্যান্য গুম্ফার মতো এটি পাহাড়ের ওপরে প্রতিষ্ঠিত নয়। সমতলে অবস্থিত। দূর থেকে গুম্ফাটি দেখা যায় না। গুম্ফার বুদ্ধ মূর্তি এবং কাঠের ওপরে খোদাই কাজ নাকি দেখার মতো।

কিন্তু দেখা হল না আমাদের। সরকারী বাস থামিয়ে আলচি দেখে আসার সুযোগ নেই এখন। আবার 'লে' থেকে এই ৬৪ কিলোমিটার এসে আলচি দর্শন করে যাওয়াও সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে।

—এই যে কাঠের পুলের ওপর আলচি গ্রামের পথ চলে গেল।

কণ্ডাক্টরের কথা শুনে তাড়াতাড়ি পথের ডানদিকে তাকাই। মূল পথ থেকে একটা কাঁচা মোটর পথ নেমে গেছে সিন্ধুর বেলাভূমিতে। সোনে একটা কাঠের পুল। জীপ যেতে পারে। অদূর ভবিষ্যতে নাকি ঐ পুল এবং পথের সংস্কার-সাধন করা হবে। কার্গিল থেকে লে যাবার পথে বাসগুলো ইচ্ছে করলে আলচি ঘুরে যেতে পারবে।

বেলা চারটের সময় সাসপোল পৌঁছন গেল। আমরা শ্রীনগর থেকে ৩৭২ ও কার্গিল থেকে ১৬৯ কিলোমিটার এলাম। এখান আমাদের সেই সুযোগ নেই। অতএব বাসগো আর তার গুম্ফার কথা স্মরণ করেই সন্তুষ্ট থাকতে হল। এমনকি গ্রামখানি ভাল করে দেখার সুযোগ পেলাম না। বাস বাসগো গ্রাম ছাড়িয়ে

এগিয়ে চলল। আর মাত্র ৪২ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হবে।

পথের পাশে আবার তেমনি সুবিশাল পাথুরে সমতল। তারপরে পাহাড়। পাহাড় তো নয়, সেই মঠ মন্দির প্রাসাদ দুর্গ কিম্বা পশু-পাখির সারি সারি মূর্তি।

আমরা দেখি আর দেখি। কিন্তু জানলা খুলতে পারি না। এখানেও তেমনি প্রবল বাতাস—সেই মত্ত পবন। না, কোনো কারিগর নয়, এই দুর্বার বাতাসের ক্ষয় কার্যের ফলেই পাহাড়গুলি অমন রূপ নিয়েছে।

এখন বিকেল সওয়া পাঁচটা। আবার একটা সবুজ জনপদের ভেতর দিয়ে চলেছি। এ গ্রামটির নাম নিম্মু। আর মাত্র ৩৬ কিলোমিটার।

গ্রাম খানিকে দেখি। পথের পাশে একখানি সাইনবোর্ড—'Forest Plantaticn, Nımmu'; তারপরে বাড়ি ঘর আর ক্ষেত। একখানি বড় বাড়ি সামনে লেখা—'High School'. তার মানে নিম্মু বেশ সমৃদ্ধ জনপদ।

জনপদ ছাড়িয়ে এসেছি। কিন্তু এখনও জনজীবনের ছোঁয়া লেগে রয়েছে। পথের পাশে পর পর চারটি চোর্ত্তেন বা তিব্বতী ঢঙের সমাধি মন্দির—বেশ বড় বড়।

পথটা আবার একে বেঁকে ওপরে উঠছে। সেই পথ বেয়ে আমরা উঠে এলাম ওপরে। সিন্ধু পড়ে রইল নিচে।

একটু বাদেই আরোহণ শেষ হল, শুরু হল অবরোহণ। আবার নেমে এলাম রুক্ষ সমতলে, দেখা হল সিন্ধুর সঙ্গে।

না, একা সিন্ধু নয়। সিন্ধুর সঙ্গে জাঁসকার। জাঁসকার পর্বত-শ্রেণীর তুষার বিগলিত ধারা জাসকার নদী এখানে এসে মহা-সিন্ধুকে সমৃদ্ধ করেছে। সঙ্গমটি ভারী সুন্দর। আমরা দেখি—অপলক নয়নে তাকিয়ে থাকি, সেই অপরূপের দিকে।

সুন্দর সর্বদা ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং সে শুভদৃষ্টি সংক্ষিপ্ত। সঙ্গম পড়ে থাকে পেছনে, আমরা এগিয়ে আসি সামনে। এখান থেকে লে মাত্র ৩৪ কিলোমিটার। শ্রীনগর থেকে আমরা ৪০০ কিলো-মিটার পাহাড়ী পথ পেরিয়ে এলাম।

প্রায় সমতল ও সোজা পথ কিন্তু পথের দু পাশেই পাহাড়। সামনে খানিকটা দূরে পথের সোজাসুজি একটা পাহাড়। এখানে মনে হচ্ছে পাহাড়টাকে কেটে পথ তৈরি করা হয়েছে। একটু বাদেই বুঝতে পারি আমার অনুমান মিথ্যে নয়।

আবার আঁকাবাঁকা পথ। কখনো নিচে নামছি। কখনো ওপরে উঠে আসছি। বাতাস আর রোদের কোনো ব্যতিক্রম নেই। বিকেল সাড়ে পাঁচটা বেজে গিয়েছে। কিন্তু রোদের তেজ একটুও কমে নি।

বাস থেমে গেল। পথের বাঁদিকে একখানি বড় ও কয়েক-খানি ছোট ঘর। চায়ের দোকানও রয়েছে। বড় ঘরখানির সামনে সাইনবোর্ড।

'Gurudwara, Pathar sahib Laman Guru Shree Nanak Debji.'

বুঝতে পারছি স্থানীয় শিখরা নির্মাণ করেছেন এই গুরুদ্বার। কিন্তু লাদাখের মাটিতে এসে গুরুনানক লামাগুরু হয়ে গেছেন। আর গুরুদ্বারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন লাদাখের লামাপ্রধান শ্রীশ্রীঅশোক বাকুলা, বছর চারেক আগে। ধর্মকে হতে হবে স্থানোপযুগী এবং কালজয়ী। গতিশীলতা ধর্মীয় অগ্রগতির প্রধান পাথেয়।

ড্রাইভার ও কণ্ডাক্টরের সঙ্গে আমরাও বাস থেকে নেমে আসি। তাদের পেছনে গুরুদ্বারে প্রবেশ করি। দর্শন করি।

দর্শনের পরে চায়ের বিরতি। প্রায় পঁচিশ মিনিট বাদে

গাড়ি ছাড়ে। কণ্ডাক্টর বলে এখান থেকে 'লে' ২৫ কিলোমিটার। আধ ঘণ্টার বেশি লাগবে না।

আধ ঘণ্টা! আর মাত্র আধ ঘণ্টার! আধ ঘণ্টা পরেই পাহাড়ী পথে আমার জীবনে দীর্ঘতম বাস যাত্রা শেষ হবে। আমি পৌঁছব লাদাখের মধ্যমণি লে শহরে। আনন্দে আমার সারা শরীর শিহরিত হয়ে উঠছে।

কণ্ডাক্টর ঠিকই বলেছে, উচ্চতা যাই হোক প্রায় সমতল ও সোজা পথ। বাস বেশ জোরে চলেছে। দু-পাশের পাহাড়ী সৌন্দর্য কিন্তু অবিকৃত। কাছের পাহাড়গুলোয় নানারঙের বিচিত্র সমাবেশ আর দূরের ধূসর রঙের পাহাড় গুলোর মাথায় মাথায় সাদা প্রলেপ। না, সাদা নয়, সেখানে সোনালী পরশ। অস্তরবির রক্তিম রশ্মি রূপোলী শিখরে সোনা ঢেলে দিয়েছে। আমরা লাবণ্যময় লাদাখের অন্তরলোকে পৌঁছে গিয়েছি।

শুধু সিন্ধুকে দেখতে পাচ্ছি না। তবে তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করছি। বেশ বুঝতে পারছি সে আছে। কেবল খানিকটা দূরে সরে গিয়েছে। তাই কোনো বেদনা বোধ করছি না। কারণ জানি—সে আসবে। আবার আসবে আমার কাছে। আমি যে তারই কাছে এসেছি।

সামনে বাঁদিকে একটা পাহাড়ের মাথায় সুবিরাট প্রাসাদ আর নিচে পথের ধারে অনেক বাড়ি ঘর। কণ্ডাক্টর বলে ওঠে, "ফিয়াং গুম্ফা।"

এটি লাদাখের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুম্ফা। অবশ্য দর্শনীয়। আগামীকাল আমরা এই গুম্ফা দেখতে আসব। এখান থেকে 'লে' মাত্র ১৬ কিলোমিটার।

কিন্তু কালকের দেখা কাল হবে। আজ গাড়িতে বসে যতটা পারা যায়। দেখে নেওয়া যাক। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি—

বেশ বড় গুম্ফা। অনেক উঁচুতে একটা পাহাড়ের ওপরে। আশ্চর্য সুন্দর ও বিচিত্র অবস্থান।

দেখতে দেখতে তাকে ছাড়িয়ে আসি। কিন্তু বেশি দূর এগোতে পারি না। আবার বাস থামে। কণ্ডাক্টর বলে—ফিয়াং চেক্ পোষ্ট।

না, আমাদের জন্য নয়। এখানে বিদেশী যাত্রীদের নাম ধাম জানিয়ে পাসপোর্ট দেখাতে হবে।

পরীক্ষা যতই সহজ হোক, সব মিলিয়ে কিন্তু আধ ঘণ্টা লেগে গেল। পৌনে সাতটায় বাস ছাড়ল। কণ্ডাক্টরকে জিজ্ঞেস করি—আর কতক্ষণ লাগবে।' সে একই উত্তর দেয় আধ ঘণ্টা। ভদ্র-লোকের এক কথা।

প্রশস্ত ও উৎরাই পথ বেয়ে নেমে চলেছি সামনের উপত্যকায়। বাস বেশ জোরে ছুটছে। কিন্তু তার চাইতেও জোরে ছুটছে আমার মন। 'লে' শহর এসে গেল বলে।

আমার আশা পূর্ণ হল। আবার দেখা হল সিন্ধুর সঙ্গে। সে এসে হাজির হয়েছে আমার ডান পাশটিতে খানিকটা নিচে।

সহসা জনৈক সহযাত্রী বলে ওঠে—"ডানদিকে দেখুন, পাহাড়ের ওপর সিপুতক গুম্ফা।"

নেতা যোগ করে, আগামীকাল বিকেলে ফিয়াং থেকে ফেরার পথে আমরা এই গুম্ফা দর্শন করব।"

এবারে কণ্ডাক্টর কথা বলে, "এখান থেকে 'লে' শহর ১২ কিলোমিটার, দশ মিনিটে পৌঁছে যাবেন।"

যাকগে, আধ ঘণ্টার স্থায়ীত্ব ঘুচে গেছে'।

অবশেষে সিন্ধু তীরের পথ বেয়ে নেমে এলাম সুবিশাল সমতলে। সামনে সারি সারি বাড়ি আর বিমান ক্ষেত্র। দু-দিন বাদে আমরা যেন আবার প্রবেশ করছি নাগরিক সভ্যতার মাঝে।

পেরিয়ে এলাম ক্যান্টনমেণ্ট আর বিমান ক্ষেত্র। এখন দিল্লী

চণ্ডীগড় ও জম্মু, শ্রীনগর থেকে নিয়মিত যাত্রীবাহী বোয়িং যাতায়াত করছে। শ্রীনগর থেকে আমরা বাস যোগে দুদিনে যে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করলাম, সেটুকু বিমানে আসতে মাত্র আধঘণ্টা সময় লাগে। কিন্তু সে আসার সঙ্গে এ আসার অনেক তফাৎ। বিমান যাত্রায় সুখ আছে স্বস্তি নেই। আরাম আছে বৈচিত্র্য নেই। গতি আছে জীবন নেই। বিমান যাত্রায় শরীরের কষ্ট বাঁচে কিন্তু মনের খোরাক মেটে না।

বিমানবন্দরের পরেই শহর শুরু হয়ে গেল। শুধু সুপ্রাচীন নয়, আধুনিক শহরও বটে। প্রশস্ত সমতল মসৃন পথ। পথের পাশে ঝকঝকে বাড়ি ঘর—হোটেল রেস্তোরাঁ ও দোকান পাট। অধিকাংশ বাড়ি দু-তিনতলা। সর্বদা গাড়ি যাতায়াত করছে। এসব দেখে কে বলবে আমরা প্রায় কেদারনাথ ধামের মতো উঁচুতে রয়েছি। লে শহরের উচ্চতা ১১,৪৯৬ ফুট।

বিকেল ঠিক সোয়া সাতটার সময় টুরিষ্ট রিসেপশন্ সেণ্টারের সামনে এসে বাস থামল। চারিদিক থেকে মালবাহকরা ঘিরে ধরল। তাদের ভিড় ঠেলে নেমে আসি পথে।

অবশেষে বিদায়ের পালা। এই নিয়ম। পথের পরিচয় পথেই শেষ করে দিতে হয়। এরা আমার কেউ নয়, কেবল এক বাসে এসেছে। তাহলেও পাহাড়ী পথে আমার জীবনের দীর্ঘতম বাসযাত্রাটি সুসম্পন্ন হল। এইসব দেশী বিদেশী পর্যটকদের সঙ্গে। দুটি দিন সুখে দুঃখে বিপদে ও আনন্দে সর্বদা একসঙ্গে ছিলাম। এখন তাই এদের ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে।

তবু নিতে হয় বিদায়। আবার দেখা হবে, এই আশ্বাসে মনকে প্রবোধ দিয়ে নেতার সঙ্গে এসে ট্যাক্সীতে উঠি।

লে শহরের জনবহুল পথ দিয়ে ট্যাক্সী ছুটে চলেছে হিমালয়ান হোটেলের দিকে। সন্ধ্যা নেমে আসছে পথে—লাদাখের বুকে। সন্ধ্যা তারাকে স্বাক্ষী রেখে এই গোধূলি লগ্নে আমার আজ লে নগরীর সঙ্গে শুভদৃষ্টি হল।

---

## ।। আমি আটায়ে ভারতীয় ।।

ভ্রমণের আরেক নাম নেশা। আর হিমালয় ভ্রমণ হল সেই নেশার রাজা।

এই নেশা কবে আমার বালক-মনে উপ্ত হয়েছিল, তা সঠিক স্মরণ করা কঠিন। তবে এই বাসনা-বনস্পতির মূলদেশে প্রথম যিনি জলসেচন করেছেন, তাঁর নাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর যিনি তাকে প্রথম পল্লবিত করেছেন, তাঁর নাম প্রবোধকুমার সান্যাল। ইন্দ্রনাথ কেবল শ্রীকান্তের প্রভাত-জীবনকে ভ্রমণের নেশায় মাতান নি, আমাদের কৈশোর-জীবনকেও অস্থির করে তুলেছেন।

কিন্তু সেই অস্থিরতার অবসান হওয়াই উচিত ছিল। কারণ বঙ্গবিভাগের পরে পূর্ববঙ্গের এক ছিন্নমূল বড় পরিবারের বড় ছেলের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ভ্রমণকে বিলাসিতা বলে ভাবতে বাধ্য হয়েছিলাম। এবং সওদাগরী অফিসের চাকরি আর প্রাইভেট-ট্যুশানীর ভেলায় চড়ে সংসার-সমুদ্র পাড়ি দেবার চেষ্টা করেছিলাম।

জীবনদেবতা বোধকরি শেষ পর্যন্ত আমার সেই স্থির-জীবনকে বরদাস্ত করতে পারলেন না। আমাকে 'মহাপ্রস্থানের পথে' নামে একটা ইন্টারভেনাস ইঞ্জেকশন দিয়ে দিলেন। ঘুমিয়ে পড়া

নেশাটা আবার জেগে উঠল। এবং সেই সঙ্গে ভবঘুরে রোগের বীজাণু রক্তে মিশে গিয়ে আমাকে সারাজীবনের তরে অস্থির করে তুলল।

প্রায় পঁয়তিরিশ বছর হল আমি পথিকবৃত্তি গ্রহণ করেছি। তবে এটি কিন্তু বঙ্গবিভাগের জন্যই সম্ভব হয়েছে। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের মতো বঙ্গবিভাগেরও একটা সুফল আছে বৈকি! আমরা পৈতৃক ভিটে-মাটি ছেড়ে ছিন্নমূল হয়েছি বটে, কিন্তু বিশ্বের বিচিত্রতম সুবিশাল দেশের স্বাধীন নাগরিক হতে পেরেছি। আমি নেফা হতে গুজরাত, কন্যাকুমারী থেকে লাদাখের পথে পদচারণা করার অবাধ অধিকার লাভ করেছি। চন্দ্রনাথ অদর্শনের যন্ত্রণা ভুলতে আমার সময় বেশি লাগে নি। কারণ শুনেছি--দেশবিভাগ না হলে নাকি দেশ স্বাধীন হত না এবং বিদেশের ঠাকুরের চেয়ে স্বদেশের কুকুর অনেক ভাল।

আরেকটা কথা—ভারতে পালিয়ে না এলে হয়তো আমার ভ্রমণের নেশাও ইন্দ্রনাথের মতো ডিঙি চড়ার মধ্যেই শেষ হয়ে যেতো। কারণ আমার পক্ষে ইন্দ্রনাথ অর্থাৎ ভাগলপুরের রাজেন মজুমদারের মতো নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। ফলে আমি কোনদিন বিশ্বের সুন্দরতম শৃঙ্গ সিকিমের ‘সিনিয়লচু’ দর্শন করার সুযোগ পেতাম না।

নিজের কথা অনেক হল, এবারে ভ্রমণের কথায় আসা যাক। পথিক-জীবনে দূরে ও কাছে যেমন অনেক বিচিত্র ও সুন্দর স্থান দেখেছি, তেমনি অসংখ্য ভাল ও মন্দ মানুষের সংস্পর্শে এসেছি। তাদের কথা কিছু লিখেছি, কিন্তু অধিকাংশই না-লেখা রয়ে গিয়েছে। তেমনি একজনের কথাই আজ প্রথম মনে পড়ছে। তাঁকে দিয়েই শুরু করা যাক।

প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর আগের কথা। আমি তখনও লেখার

জগতে আসি নি বলা চলে। একটা ইম্পোর্ট ফার্মে কাজ করি। আমার কোম্পানী বুলগেরিয়া থেকে ইস্পাত অর্থাৎ লোহা-লক্কর আমদানী করতেন। তখন উত্তর-পূর্ব ভারতে ইস্পাতের কারখানা বলতে টাটা ও বার্ন কোম্পানী। কিন্তু কারখানা তৈরি হচ্ছে দুর্গাপুর, রাউরকেল্লা ও ভিলাইতে। সেই সঙ্গে দামোদর রিহান্দ্‌ ও কোশী প্রভৃতি পরিকল্পনার কাজ চলছে। সুতরাং ভারত সরকার বিদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণ ইস্পাত আমদানী করাতেন। আমার কোম্পানী ভারত সরকারের প্রতিনিধি রূপে বুলগেরিয়া থেকে ইস্পাত আমদানী করে স্টীল্‌ কণ্ট্রোলারের নির্দেশ অনুসারে বিভিন্ন সংস্থাকে সরবরাহ করতেন। বলা বাহুল্য কলকাতা বন্দর থেকে বেশির ভাগ মাল যেতো রেলপথে এবং তখনও রেলের পরিবহণ ব্যবস্থা খুব একটা ভাল ছিল না। ফলে প্রায়ই দেখা যেতো এক জায়গার মাল আরেক জায়গায় চলে গিয়েছে। এইভাবে একবার কোশীর মাল রিহান্দে চলে গেল আর রিহান্দের মাল কোশীতে। একে রিহান্দের মাল ছিল বেশি, তার ওপরে কণ্ট্রোলের জিনিষ। সুতরাং কোম্পানীর আদেশে আমাকে ছুটতে হল পাটনায়—কোশীবাঁধ প্রকল্পের হেড-অফিসে। সেখান থেকে চীফ্‌ ইঞ্জিনীয়ারের চিঠি নিয়ে গঙ্গা পেরিয়ে কাটিহার। কাটিহার থেকে যোগবানী লাইনের গাড়ি ধরে তার আগের স্টেশন বাত্‌নাহা। বাত্‌নাহা নেপাল সীমান্তে বিহারের সহর্ষ জেলায় অবস্থিত। কোশীবাঁধ প্রকল্পের প্রধান কর্মক্ষেত্র বীরপুর বাত্‌নাহা থেকে মাত্র কয়েক মাইল। তখন সবে বাঁধের কাজ শুরু হয়েছে, সুতরাং বাত্‌নাহা একটি গণ্ডগ্রাম। কিন্তু শুনলাম বীরপুরের নিকটতম রেলস্টেশন বলে বাত্‌নাহাতেই প্রজেক্টের স্টোরস। অতএব আমার কোম্পানীর বাড়তি মাল সেখানেই রয়েছে।

রেল থেকে নেমে কাঁচাপথ ধরে একটু এগিয়েই স্টোরস। তার কাঁটার বেড়া দেওয়া বিরাট এলাকা। হাজার হাজার টন লোহা-লক্কর যন্ত্রপাতি বালি-সিমেণ্ট ও ইট-পাথর ইত্যাদি নানা জিনিস-পত্রের পাহাড়। পথের ধারে টিনের ছাউনিতে অফিস।

অফিসে ঢুকে দেখি কোট-প্যাণ্ট টাই পরে একজন সুশ্রী তরুণ চেয়ারে বসে আছেন। হাতে তাঁর জ্বলন্ত 'গোল্ড ফ্লেক'।

আমি তাঁকে নমস্কার করি চীফ্ ইঞ্জিনীয়ারের চিঠিখানি হাতে দিই। একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে তিনি বলেন—বসুন। কিন্তু এখন তো একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার নেই।

—কখন আসবেন?

- আজ আর আসবেন না।

—তাহলে . ! আমি অসহায় দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাই।

তিনি আমাকে আশ্বস্ত করেন। বলেন—আমাকে বলতে পারেন, আমি স্টোরস ক্লার্ক।

হালে পানি পেলাম। তাঁকে বললাম সবকথা।

একটু ভেবে নিয়ে তিনি উত্তর দিলেন—রেল যখন আপনাদের সার্টিফিকেট দিয়েছে, তখন মাল নিশ্চয়ই বেশি এসেছে। কিন্তু 'স্টক' না মিলিয়ে তো বাড়তি মাল ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়। আর এতবড় স্টোরসে যে স্টক্ মেলানো সম্ভব নয়, তা তো বুঝতেই পারছেন।

—তাহলে কি আমাদের বাড়তি মাল আমরা ফেরৎ পাবো না?

—না। তবে যদি মালটা আপনি এখানে বেচে যেতে রাজী থাকেন, তাহলে আপনি কণ্ট্রোল দরে সেই দশ টন মালের দাম পেয়ে যাবেন।

—কিন্তু স্টীল্ কণ্ট্রোলারের অনুমতি ছাড়া বিক্রি করব কেমন করে?

—অনুমতি আনিয়েই বিক্রি করবেন। কলকাতায় টেলিগ্রাম করুন। কি লিখবেন, তাও বলে দেব। যতদিন অনুমতি না আসে বীরপুরের স্টাফ্ মেসে আপনার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেব। মেম্বাররা অধিকাংশ অবিবাহিত বাঙালী। আপনার কোনো অসুবিধে হবে না। কেবল অনুমতি আসার পরে ঐ দশ টন লোহা কণ্ট্রোল দরে আমাকে বেচে যেতে হবে।

আপনাকে!

— হ্যাঁ, আমাকে। একবার থেমে একটু মৃদু হাসেন। তারপরে আবার বলতে থাকেন—আরে মশাই, অফিসের কাজের পরে পার্ট-টাইম বিজনেস না করলে আজকাল কি কারও পেটের ভাত যোগাড় হয়। তাছাড়া দেখতেই পাচ্ছেন পরিবার-পরিজন সবাইকে ছেড়ে একা এখানে পড়ে আছি। তাই দামী জামা-কাপড় পরে, ভাল সিগারেট খেয়ে, একটু-আধটু 'ড্রিঙ্ক' ইত্যাদি করে মনটাকে ঠিক রাখতে হয়। এখানে তো মশাই, কিছুই পাওয়া যায় না, সব পাটনা থেকে আনাতে হয়। শুনলে অবাক হবেন, এইসব কোর্ট-প্যাণ্ট পর্যন্ত কাটিহার থেকে কাচিয়ে আনতে হয়। বাড়তি রোজগার না থাকলে এত খরচ চলবে কেমন করে? আমি তো মশাই, বিহার গভর্ণমেণ্টের লোয়ার-ডিভিশন ক্লার্ক, মাসিক মাইনে আশি টাকা।

তারপরে সব ঘটনার বিস্তারিত বিবরণের প্রয়োজন নেই। শুনে রাখুন, তাঁর পরামর্শে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দশ দিনের মধ্যে আমি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে মাল বিক্রির অনুমতি পেয়ে গিয়েছিলাম। আর সেই দশ দিন বীরপুরের মেস-এ থেকে-খেয়ে মহানন্দে ভারত-নেপাল সীমান্ত এবং কোশীবাঁধের কাজ দেখে বেড়িয়েছিলাম।

অনুমতি আসার পরে আমি আবার বাত্নাহা চলে এসেছি।

বলা বাহুল্য প্রকল্পের গাড়িতেই যাওয়া-আসা করেছি। আর স্টোরস্ ক্লার্কই সে ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। বাত্‌নাহা এসে আমাকে বেশিক্ষণ বসে থাকতেও হয় নি। আমার সই করা বিল ও চালানের বিনিময়ে তিনি আমাকে নগদ টাকায় দশ টন লোহার দাম মিটিয়ে দিয়েছিলেন। কথায় কথায় জিজ্ঞেস করেছিলাম—আপনার কত থাকবে?

তিনি একটু হেসে উত্তর দিয়েছিলেন—এখুনি বলতে পারছি না। সেটা নির্ভর করছে আপনার সই করা চালানের সাহায্যে আমি কবার দশ টন করে মাল বার করতে পারি?

—মানে!

—খুবই সহজ। আমাদের স্টোরসে যে লোহার পাহাড় জমেছে, তা থেকে দশ টন আর পঞ্চাশ টন সরানো একই কথা। শুধু গেট-কিপারের সঙ্গে একটু ব্যবস্থা করে নিতে হবে, এই যা।

তাঁর সেকথার সেদিন কোনো জবাব দিতে পারিনি। তবে কাটিহার ফিরে আসার পথে বার বার আমার যুবকমনে একটি প্রশ্ন জেগে উঠছিল—দেশ স্বাধীন হবার দশ বছরের মধ্যে এ আমি কি দেখছি, এই কি ভবিষ্যৎ ভারতের ছবি?

সেদিন সে প্রশ্নের উত্তর পাই নি। কিন্তু আজ আর বলতে দ্বিধা নেই সেই শীতের দুপুরে অনুন্নত বাত্‌নাহা গ্রামে দাঁড়িয়ে আমি বর্তমান ভারতের রূপই প্রত্যক্ষ করেছিলাম।

পথিক-জীবনের ফেলে-আসা দিনগুলোর কথা ভাবতে বসলে মনের দুয়ারে ভিড় জমে যায়। সেই ভিড়ের ভেতর থেকে কোনো বিশেষ ঘটনা বা বিশিষ্ট মানুষকে বেছে নেওয়া আমার পক্ষে খুবই কঠিন। কারণ তারা সবাই আমার সমান প্রিয়। তবু কেন জানি না, তাদের একজনের কথা আজ বড্ড বেশি মনে পড়ছে।

সে একজন অতি সাধারণ মানুষ। নাম তার রতনলাল, বাড়ি তার কুমায়ুনে—হিমালয়ের গহন-গিরি-কন্দরে। সে তখন কাঠগুদাম স্টেশন ক্যান্টিনে বেয়ারার কাজ করত।

১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাস। পর্বতারোহী প্রাণেশ চক্রবর্তীর সঙ্গে পিণ্ডারী হিমবাহ দর্শন করতে যাচ্ছিলাম। পিণ্ডারী হিমালয়ের সবচেয়ে সহজগম্য হিমবাহগুলির অন্যতম। কলকাতা থেকে লখনউ হয়ে কাঠগুদাম পৌঁছতে হয়। সেখান থেকে বাসযোগে ভারারী সারাদিন লেগে যায়। পরদিন সকালে শুরু হয় পদযাত্রা। ভারি সুন্দর পথ। যাবার সময় চারদিন ও ফেরার সময় তিনদিন হাঁটতে হয়। পথে চমৎকার ডাকবাংলো আছে। ভারারীতে মালবাহক ও ঘোড়া পাওয়া যায়। পিণ্ডারী হিমবাহে দাঁড়িয়ে দেখা যায় ১৭,৭০০ ফুট উঁচু ট্রেল্‌স গিরিবর্ত্ম এবং কুমায়ুন-হিমালয়ের কয়েকটি অনিন্দ্যসুন্দর শৃঙ্গ।

যাক্‌ গে, যেকথা বলছিলাম। আমি ও প্রাণেশ কাঠগুদাম থেকে ভারারীর বাসে উঠেছি। আমরা বসেছি সামনের দিকে—আপার ক্লাশে। আমাদের সহযাত্রীরা, বিশেষ করে যাঁরা পিছনের দিকে বসেছিলেন, তাঁরা সকলেই গ্রাম্য মানুষ। কাজ-কর্মের জন্য কাঠগুদাম কিম্বা হলদোয়ানী গিয়েছিলেন। তখন ঘরে ফিরছেন। কিন্তু সেই পেছন থেকেই মাঝে মাঝে ভুল উচ্চারণের ইংরেজী শব্দ কানে ভেসে আসছিল। কথা বলছিল একজনই, বাকি সবাই শ্রোতা। বক্তার বক্তব্যে একটা সবজান্তা ভাব। শুনতে বেশ মজা লাগছিল। মাঝখানে প্রাণেশ শুধু একবার মন্তব্য করল—সুন্দরবনে বান্দর রাজা।

বাস কৌসানী পৌঁছল। অনেক যাত্রী নেমে গেলেন। সামনের দিকটা প্রায় ফাঁকা হয়ে গেল। বাস আবার চলতে শুরু করল। আর তখুনি সেই সবজান্তা মানুষটি পেছন থেকে উঠে

এসে একেবারে আমাদের পাশের সিটে এসে বসে পড়ল। বুঝতে পারলাম এবার সে আমাদের জ্ঞান দিতে এলো। অতএব গম্ভীর হয়ে জানলা দিয়ে দূরের তুষারাবৃত শৃঙ্গমালার দিকে তাকিয়ে থাকি।

কিন্তু তাতে কোন ফলই হল না। লোকটি সোজাসুজি বলে বসল - আপনাদের সঙ্গে আলাপ করতে এলাম সাব্। আপনারা কোথা থেকে আসছেন।

বাধ্য হয়ে বলতে হয় - কলকাতা।

—কলকাত্তা! লোকটি যেন লাফিয়ে ওঠে—আপনারা বঙালী?

আমি মাথা নাড়ি। সে সঙ্গে সঙ্গে দুহাত জোড় করে মাথায় ঠেকায়। তারপরে নিজের পরিচয় দিয়ে বলে— আমি বঙালীদের বড়ই পেয়ার করি। আমার ক্যান্টিনের ম্যানেজারসাব্ বঙালী, তিনি আমাকে খুব পেয়ার করেন।

—তা তুমি এখন কোথায় চলেছো?

--বাড়িতে। ম্যানেজারসাব্ পাঁচ দিন ছুটি দিয়েছেন। সামনেই আমার বাড়ি, গরুড়ের কাছে। একটু বাদেই বাস থেকে নামব। এখন বলুন, কিভাবে আপনাদের সেবা করতে পারি?

প্রাণেশ বিরক্ত হয়, কানে কানে মন্তব্য করে—একেবারে বিনয়ের অবতার।

বিশ্বাস করতে আমারও মন চায় না। তবু সেই সিংহ আর মূষিকের গল্পটা মনে পড়ে যায়। ভাবি - এ সংসারে কখন কাকে দিয়ে কি সাহায্য হবে, তা কি কেউ আগের থেকে জানতে পারে? গল্পের মূষিক যে পশুরাজ সিংহকে মুক্ত করেছিল।

রতনলাল তাগিদ দেয়—সাব্! গরুড় এসে গেল। বলুন, আপনাদের কি সেবা করতে পারি?

বললাম—দেখো, আমাদের রিটার্ন টিকেট কাটা আছে। কিন্তু আজ কাঠগুদামে নেমে তাড়াতাড়িতে ফেরার রিজার্ভেশন করতে পারি নি।

—আমি কাঠগুদাম ফিরে করে রাখব সাব্। থ্রি-টায়ার বার্থ রিজার্ভ করে দেব।

মুশকিলে পড়া গেল। এর হাতে টিকেট দেওয়া উচিত হবে না। অথচ টিকেট ছাড়া তো রিজার্ভেশন হয় না। এখন কি বলি?

কিছুই বলতে হল না আমাকে। রতনলালই আবার বলে—একটা কাগজে আপনাদের নাম, টিকেট নম্বর ও যাবার তারিখ লিখে দিন, আমি আপনাদের জন্য বার্থ রেখে দেব। রিজার্ভেশনের বাবুদের আমি যে রোজ বিনে পয়সায় চা খাওয়াই।

হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। তাড়াতাড়ি রুকস্যাক থেকে কাগজ কলম ও টিকেট বের করে সব লিখে দিই।

একটু বাদেই বাস গরুড় পৌঁছল। রতনলাল আমাদের সেলাম করে গাড়ি থেকে নেমে গেল। আমরা এগিয়ে চললাম পিণ্ডারী হিমবাহের পথে।

পিণ্ডারী দেখে রাণীক্ষেত ও আলমোড়া বেড়িয়ে আমরা যখন নৈনিতাল এলাম, তখন আমাদের আর্থিক অবস্থা খুবই শোচনীয়। তবু আমরা নির্ধারিত দিনকয়টি নৈনিতালে কাটাতে বাধ্য হলাম। একে লখ্নউ থেকে রেলওয়ে রিজার্ভেশান করা ছিল, তার ওপরে অর্থাভাবের জন্য ভ্রমণ-সংক্ষেপ করা নিতান্তই কাপুরুষের কাজ। তাই সস্তার হোটেলে একখানি ঘর ভাড়া নিয়ে একবেলা খেয়ে দিনগুলো কাটিয়ে দিলাম। তারপরে নির্দিষ্ট দিনে যখন কাঠগুদাম রওনা হলাম, তখন আমরা একেবারেই নিঃস্ব হয়ে পড়েছি। বলা বাহুল্য রতনলালকেও সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছি।

কিন্তু বাস থেকে নেমে স্টেশনে ঢুকতে গিয়েই শুনতে পেলাম

সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর—এত দেরি করলেন সাব্! আমি সেই সকাল থেকে আপনাদের পথ চেয়ে আছি। যাক যে, এসে গেছেন। এবারে মালগুলো আমাকে দিন।

সে কাছে আসে। আমরা আপত্তি করি। সে অবাধ্য হয়। আমাদের পিঠ থেকে রুকস্যাক দুটি খুলে নিয়ে বলে-চলুন!

আমরা তাকে অনুসরণ করি। সে একেবারে প্রথম শ্রেণীর প্রতীক্ষালয়ে এনে হাজির করে। মালগুলো এককোণে সাজিয়ে রেখে বেয়ারাকে বলে—আমার মেহমান। মালগুলো একটু দেখিস! লোকটি মাথা নাড়ে। তারপর রতন আমাদের বলে—আপনারা হাতমুখ ধুয়ে নিন, আমি আসছি।

বাথরুম থেকে ফিরে এসে দেখি রতনও আসে নি। ভাবলাম ভালই হয়েছে। নৈনিতাল থেকে শুধু চা খেয়ে বেরিয়েছি। বড্ড খিদে ও চায়ের পিপাসা পেয়েছে। রেলওয়ে ক্যান্টিনে খাবারের দাম বেশি। তার ওপরে সেখানে রতন রয়েছে। হয়তো জোর করে টোস্ট আর ওম্‌লেট খাইয়ে দেবে। তার চেয়ে স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে অল্প পয়সায় চা ও চানাভাজা খেয়ে আসা যাক।

চানা খেয়ে প্রতীক্ষালয়ে ফিরে এসে দেখি রতন দাঁড়িয়ে রয়েছে আর সেণ্টার-টেবিলে একখানি ট্রে—তিনখানি প্লেটে রুটি, মাখন এবং ওম্‌লেট।

আঁতকে উঠি! কোথা থেকে এই খাবারের দাম দেব?

—কোথায় গিয়েছিলেন? তিরস্কারের স্বরে রতন বলে—আমি সেই কখন থেকে খাবার নিয়ে বসে আছি। নিন তাড়াতাড়ি খেয়ে নিন, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। আমি চা নিয়ে আসছি।

আমাদের কিছু বলবার সুযোগ না দিয়েই সে বেরিয়ে যায়। আমি প্রাণেশের মুখের দিকে তাকাই। সে হতাশ স্বরে বলে—কি করবেন? খেয়ে নিন।

—কিন্তু দাম দিবি কেমন করে?

—ঘড়ি বন্দক দিয়ে যেতে হবে।

সুতরাং প্রাণেশ রুটিতে মাখন মাখাতে শুরু করে, আমি ওমলেটে নুন-মরিচ ছিটিয়ে দিই। অনেকদিন এমন ভাল খাবার খেতে পাই নি।

যথা সময়ে রতন 'পট'-বোঝাই চা নিয়ে আসে।

খাবার পরে সে বলে এবারে রেলের টিকেট নিয়ে আমার সঙ্গে চলুন, রিজার্ভেশানবাবু কাল থেকে তাগিদ দিচ্ছেন। এভাবে বার্থ রেখে দেওয়া খুবই বেআইনী। মাস্টারসাব্ খাতা দেখলে মুসকিলে পড়ে যাবেন।

সেদিন বাসে বাসে নেহাৎই কথার ছলে বলেছিলাম। তাই কথাটা বেমালুম ভুলে গিয়েছি। কিন্তু ক্যান্টিনবেয়ারা রতনলাল ভোলেনি তার সদ্য পরিচিত মেহমানদের কথা।

রিজার্ভেশান কাউণ্টারে আসি। রতন পরিচয় করিয়ে দেয়। ভদ্রলোক হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। বলেন,—তাড়াতাড়ি টিকেট ছুটো দিন মশাই! এইভাবে বার্থ রেখে দেওয়া·· বুঝতেই পারছেন। কিন্তু রতনের অনুরোধ তো ফেলতে পারি না।

রতন একটু গর্বের হাসি হাসে।

ভদ্রলোক মিথ্যে বলেননি। সত্যিই বেশ কয়েকটি নাম 'ওয়েটিং-লিস্টে' বসেছে। কেনই বা থাকবে না। তখন যে স্লীপার-বার্থের জন্য কোনো ভাড়া দিতে হত না। অতএব মাত্র পঞ্চাশ পয়সার বিনিময়ে বার্থ পাওয়া গেল।

রতন ক্যান্টিনে চলে যায়। যাবার সময়ে বলে গেল—আবার বেরিয়ে যাবেন না যেন, রান্না হলেই খেতে ডাকব।

প্রতীক্ষালয়ে ফিরে এসে বহুদিন বাদে ভাল করে স্নান করে নিলাম। তারপরে ছু'জনে ছু'খানি ডেক্-চেয়ারে গা এলিয়ে

দিলাম। কিন্তু স্বস্তিতে বিশ্রাম নিতে পারি না। ক্যান্টিনের বিল শোধ করব কেমন করে? রতনের ম্যানেজার যদি ঘড়ির বিনিময়ে আমাদের মুক্তি দিতে রাজী না হন?

কিন্তু কিছুক্ষণ পরে রতনের সঙ্গে ক্যান্টিনে এসে আমার ভুল ভাঙল। রতনের ম্যানেজার অতিশয় অতিথিবৎসল। তিনি না খেয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। নিজে সামান্যই খেলেন কিন্তু জোর করে আমাদের বেশি খাইয়ে ছাড়লেন। তারপরে আর প্রতীক্ষালয়ে ফিরতে দিলেন না। সারা দুপুর ধরে গল্প করলেন। রতন ঘণ্টায় ঘণ্টায় চা পরিবেশন করে গেল। আমরা অনেকদিন ঘরছাড়া, তাই মাছ খেতে পারি নি। অতএব লোক পাঠিয়ে দু'মাইল দূর থেকে ট্রাউট্ মাছ যোগাড় করে আনলেন। নিজে সেই মাছ রান্না করে রাতের ডিনার খাওয়ালেন।

অবশেষে একসময় কানে কানে জিজ্ঞেস করলাম—আমাদের বিলটা করেছেন কি?

—বিল! আপনারা রতনের 'গেষ্ট' আর আমি আপনাদের বিল করব? তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন।

ভেবেছিলাম নিজেদের আর্থিক দুরবস্থার কথা বলে কয়েকদিন সময় চেয়ে নেব। কলকাতায় ফিরে টাকাটা পাঠিয়ে দেব। কিন্তু সেকথা আর বলার সুযোগ পাই না। শুধু বলি—এটা যে সরকারী ক্যান্টিন?

—তবু আমি আপনাদের বিল করব না। একবার থামেন তিনি। তারপরে বলতে থাকেন—দেখুন, ছোটবেলায় সৎমায়ের অত্যাচারে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছি। তারপরে বহু বছর বাদে অনেক ঘাটের জল খেয়ে এখানে এসে স্থির হলাম। কিন্তু তার আগেই আমার সংসারী হবার সময় পেরিয়ে গিয়েছে। বাড়ির সঙ্গেও আর কোনদিন যোগাযোগ করি নি। জানি না

আমার বাবা-মা বেঁচে আছেন কিনা, ভাই-বোনরা কে কোথায় আছে? তারাও হয়ত জানে, আমি মরে গেছি। আমার পয়সার প্রয়োজন নেই। যা মাইনে পাই, বেশ চলে যায়। তাই আমি রেলের পয়সা চুরি করি না। তবে হ্যাঁ, মনের মতো মানুষ পেলে তাঁদের প্রাণভরে খাইয়ে দিই। আপনারা রতনের মেহমান, সে আপনাদের নেমন্তন্ন করে নিয়ে এসেছে, আমারও আপনাদের ভাল লেগেছে। আমি আপনাদের কাছ থেকে পয়সা নেব কেমন করে?

এখানেই শেষ নয়, তারপরে রতন ও ম্যানেজারবাবু আমাদের মালপত্র নিয়ে প্ল্যাটফর্মে এসেছেন, গাড়িতে তুলে দিয়েছেন। গাড়ি ছাড়া পর্যন্ত পরমাত্মীয়ের মতো জানলার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। গাড়ি চলতে শুরু করলে হাত নেড়ে বিদায় জানিয়েছেন।

রতন আমাকে থ্রি-টায়ার স্লীপার যোগাড় করে দিয়েছিল। কিন্তু আমার পরিস্কার মনে আছে, গাড়িতে ঘুমোবার জায়গা পেয়েও সে-রাতে আমি ঘুমোতে পারিনি। চোখ বুঝলেই আমার চোখের সামনে রতনলাল ও ম্যানেজারবাবুর মুখ দু'খানি ভেসে উঠেছে। এবং সেই একদিনের পরিচিত মানুষ দুটির নিঃস্বার্থ ভালোবাসা আজও আমার মনের মণিকোঠায় অক্ষয় হয়ে আছে।

* * *

পথের স্মৃতির সবোবরে এমন অসংখ্য মানুষ শতদলের মতো বিকশিত হয়ে আছেন। তাঁরা সবাই সুন্দর। তবু সবার কথা বলা সম্ভব নয়। আর শুধু কি মানুষ? সেই সঙ্গে কত সুখ-দুঃখের কাহিনী। ভাবতে বসলে দু-চোখ জলে ভরে ওঠে অথবা সারা অন্তরে পুলকের শিহরণ জাগে। তেমনি একটা ঘটনার কথাই বলা যাক।

১৯৭২ সাল। পর্বতারোহী অমূল্য সেনের নেতৃত্বে গাড়োয়ালের তমসা উপত্যকা অভিযানে গিয়েছি। কিন্তু অভিযানের কথা বলার আগে একটু তমসা উপত্যকার কথা বলে নিতে হবে। গাড়োয়ালের এই তমসা যমুনার একটি উপনদী। আর তার উপত্যকা হিমালয়ের এক অতিশয় বিচিত্র ও রমণীয় অঞ্চল। এই উপত্যকায় এখনও একটি মহাভারতীয় সমাজ বেঁচে রয়েছে। ভাইয়েরা সবাই মিলে একটি মেয়েকে বিয়ে করেন আর তাঁদের লৌকিক-দেবতা হলেন পাণ্ডব কিম্বা কৌরব। নিম্ন-তমসা উপত্যকার অধিবাসীরা পাণ্ডবপূজারী আর উচ্চ তমসার বাসিন্দারা কৌরবভক্ত। দু'দলের মাঝে সামাজিক-কুরুক্ষেত্র আজও সমানে চলেছে।

কলকাতা থেকে রেলে ঋষিকেশ গিয়ে তারপরে বাসে করে পৌঁচেছি মোরি। সেখান থেকে তমসার তীরে তীরে পদচারণা করে আমরা উপস্থিত হয়েছি উচ্চ-তমসা উপত্যকায়। সেখানে কর্ণ এবং দুর্যোধন হলেন সবচেয়ে জনপ্রিয় লৌকিক-দেবতা। দুর্যোধনকে ওঁরা বলেন সুযোধন। এই উপত্যকার শেষ গ্রামের নাম ওসলা, উচ্চতা ৮,৯০০´ ফুট। সেখানে হর-কি দুন এবং রুইসারা গাড নামে দুটি পাহাড়ী নদী এসে মিলিত হয়েছে। মিলিতধারা তমসা নাম নিয়ে নিচে প্রবাহিত হয়ে চাকরাতার কাছে গিয়ে যমুনায় মিলিত হয়েছে। অতএব ওসলাগ্রামই তমসার প্রকৃত জন্মস্থান। আর সেখান থেকেই সেবারে শুরু হয়েছে আমাদের অভিযান।

আমরা ওসলা থেকে রুইসারার তীরে তীরে পথ চলে পৌঁচেছি ব্ল্যাক-পিক্ বা কৃষ্ণচূড়ার (২০,৯৫৬´) পাদদেশে। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, সেই সুদুর্গম শৃঙ্গের পেছনে ও রুইসারার উৎসের ওপরে অবস্থিত ১৮,৪০০´ উঁচু ধুমধার-কান্দি গিরিবর্ত্ম অতিক্রম.

করে হরশিলে উপনীত হব। হরশিল ভাগীরথী উপত্যকার একটি রমণীয় শৈলাবাস, গিরিতীর্থ গঙ্গোত্রীর ১৫ মাইল আগে অবস্থিত। অর্থাৎ সেবারে আমরা যমুনার জগৎ থেকে গঙ্গার জগতে যেতে চেয়েছিলাম।

যেতে চাইলেই যাওয়া যায় না হিমালয়ের অন্তরলোকে। সেখানে চাওয়া আর পাওয়ার মাঝে প্রচুর ব্যবধান। কৃষ্ণচূড়ার পাদদেশ থেকে স্বর্গারোহিণী (২০,৩৭০´) শৃঙ্গের পাশ দিয়ে আমরা যেদিন ওপরে রওনা হলাম, সেদিন থেকেই বরফ পড়া শুরু হ'ল—অবিরাম তুষারপাত। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত ধরে চলল সেই ববফের বৃষ্টি। আমরা তারই মাঝে পথ চলি, তারই মাঝে খাই আর ঘুমাই। যেখানে একদিনে ছ' মাইল পথ অতিক্রম করব বলে ঠিক করেছিলাম, সেখানে দু-তিন মাইলের বেশি এগোতে পারলাম না। ফলে তিন দিনেব পথ যেতে সাত-দিন লেগে গেল। তারই একটি দিনের কথা আমার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। সেদিনের ডায়েরী থেকে সেই কথাই আজ আপনাদের শোনাচ্ছি।

'৬ই অক্টোবর, ১৯৭২। আজ এই শেষ শিবির থেকে আমরা চূড়ান্ত সংগ্রামে অবতীর্ণ হব। যেভাবেই হোক আজ আমাদের ধুমধার-কান্দি অতিক্রম করতেই হবে। অনাহার অনিদ্রা, দুঃসহ শীত আর অমানুষিক পরিশ্রমে আমরা সহ্যশক্তির সীমায় এসে পৌঁচেছি। ধুমধার পেরোতে পারলেই জল আর জ্বালানি পাবো। ওপারে নিশ্চয়ই তুষারপাত হচ্ছে না।...

সকাল সাড়ে ছ'টায় শেরপা পাসাং ও দোরজি এবং পথ প্রদর্শক ফতে সিংকে নিয়ে নেতা অমূল্য সংগ্রাম শুরু করল। রঙীন পোশাক পরে সাদা বরফের ওপর দিয়ে ওরা কালো পাথরটার দিকে এগিয়ে চলল। ঐ কালো পাথরটাই গিরিবর্ত্ম। হিমালয়ের

অনেক দুর্গম গিরিবর্ত্মে ঐ রকম গ্র্যানাইট পাথরের খাড়া দেওয়াল থাকে। তার ওপরে বরফ জমতে পারে না, শত তুষারপাতেও সেটি সাদা হয় না। সীমাহীন সাদার মাঝে সেই চিরকালের কালো হিমালয় পথিকের পথের নিশানা হয়ে জেগে থাকে। আমাদের ভাগ্য ভাল। ধুমধারেও তাই রয়েছে। আর সে আছে বলে আমরা আজও এখানে রয়েছি। নইলে যা তুষারপাত চলেছে আজ ক'দিন ধরে, অনেক আগেই আমরা অভিযান বন্ধ করে দিতে বাধ্য হতাম।

সবচেয়ে আনন্দের কথা - সেই কালো পাথরটা আজ আর মোটেই দূরে নয়। বরফ না থাকলে বোধ করি ঘণ্টা দুয়েকের পথ। আর ফতে সিং বলেছে, ওখানে পৌঁছতে পারলেই আমাদের সকল শ্রম সার্থক হবে।

অমূল্যরা রওনা হয়ে যাবার ঘণ্টা দেড়েক বাদে সব গুছিয়ে নিয়ে আমরা মালবাহকদের সঙ্গে রওনা হ'লাম। অমূল্যদের নিয়ে আমরা তেরোজন সদস্য, দুজন করে শেরপা ও গাইড আর পঁচিশজন মালবাহক, সবশুদ্ধ বিয়াল্লিশজন। আমাদের প্রবীণতম সদস্য আলোকচিত্রশিল্পী সুশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বয়স পঞ্চাশ বছর। তিনি এই অভিযানের একটি রঙীন চলচ্চিত্র গ্রহণ করছেন।

অগ্রগামী অভিযাত্রীদের পদচিহ্ন ধরেই আমাদের পথ। পদচিহ্ন মানে দেহের ভারে নরম-তুষারের ওপরে একসারি গর্ত—কোথাও একফুট, কোথাও দু'ফুট, কোথাও বা তারও বেশি। কোনো গর্তে পা দিলে প্রায় কোমর অবধি তলিয়ে যাচ্ছি। অনেক কসরত করে উঠে আসতে পারছি।...

আজও রোদ ওঠে নি। এবং একটু বাদেই যথারীতি তুষারপাত শুরু হয়ে গেল। বুঝতে পারছি মালবাহকরা বৃথাই গতকাল

দুর্যোধন ও কর্ণের পূজা দিয়েছে। তাঁরাও আমাদের ওপর হিমালয়ের মতই অকরুণ। তা হোক গে, তবু আমরা এগিয়ে যাবো, যেভাবেই হোক এই সাদার জগৎ পেরিয়ে ঐ কালাচাঁদের কাছে হাজির হব।

জুতো-মোজা টুপি-দস্তানা ও প্যান্ট ভিজে গিয়েছে। উইণ্ড-প্রুফ ও ঘাড়ের ফাঁক দিয়ে তুষার পিঠে পড়েছে। বাতাসের বেগ বাড়ছে, তুষারকণা তীরের মতো মুখে এসে বিঁধছে। চশমা ঝাপসা হয়ে উঠছে। মাঝে মাঝেই মুছে নিয়ে পথ চলতে হচ্ছে। চারিদিকে শুধুই সাদা। সাদা ছাড়া আর কোনো রং নেই এই তুস্তরলোকে।

ঘণ্টা চারেক বরফের কাদা-ভাঙার পরে অমূল্যদের দেখতে পেলাম। যে তুষারাবৃত গিরিশিরাটির ওপর দিয়ে আমরা ধুঁকতে ধুঁকতে ওপরে উঠছি, তারই প্রায় সর্বোচ্চ বিন্দুতে ওরা সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঝাপসা দেখাচ্ছে। চেনা যাচ্ছে না, তবে মানুষ বলে বোঝা যাচ্ছে—যদিও দেখাচ্ছে ঠিক ছোট-ছোট ছায়ামূর্তির মতো।

ওদের ওখান থেকে কালো পাথরটার দূরত্ব সামান্যই। তাহলে আজ আমরা ধুমধার পেরোতে পারব। এবং ওপারে গেলেই জল পাবো, জ্বালানি পাবো, মাটি পাবো। পিপাসা—অনন্ত পিপাসা বয়ে বেড়াচ্ছি। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যেতে চাইছে, চারিদিকে বরফ কিন্তু কোথাও জল নেই। ওখানে পৌঁছলে জল পাবো। আগুন জ্বালিয়ে গোল হয়ে বসতে পারব। এবং ওখানে বরফ নেই, মাটি—মধুময় মাটি।

কিন্তু ওরা ওখানে অমন দাঁড়িয়ে আছে কেন? কাছের ঐ কালো, পাথরটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে না কেন? আর ওরা মাঝে মাঝেই বা এমন হারিয়ে যাচ্ছে কেন? ওখানে কি আরও

বেশি বরফ পড়ছে ?···

মনে হচ্ছে ওরা নেমে আসছে—আগে একজন, পেছনে তিন। অতএব আমাদেরও দাঁড়াতে হল। কাজটা খুবই বিপজ্জনক। কারণ বরফে নিশ্চল হয়ে থাকলে, তুষারক্ষত হতে পারে। আমাদের অধিকাংশেরই পায়ে হান্টার শু।

আধঘণ্টা বাদে প্রথম আগন্তুক কাছে আসে। এবারে চিনতে পারি তাকে—ফতে সিং।

ফতে বলে—লীডারসাব্, ওয়াপস জানে বোলা। ওপারমে কুছ দেখাই নহী যাতা।

অর্থাৎ এখানে যাওবা একটু দেখা যাচ্ছে, ওখানে 'ভিজিবিলিটি' বা চক্ষুগ্রাহ্যতা শূন্যে পর্যবসিত। অন্ধকারে আর যাই হোক, পর্বতারোহণ সম্ভব নয়। সুতরাং আজও ধুমধার পার হওয়া গেল না। সুবিধে মতো জায়গায় শিবির ফেলে পুনরায় প্রভাতের প্রতীক্ষা করতে হবে।

কিন্তু কোথায় শিবির ফেলব? আসার পথে তো সেরকম কোনো জায়গা দেখছি বলে মনে পড়ছে না।

তাহলেও নেতার আদেশ। আমরা নেমে চলি। পা দু'খানি আর দেহভার বইতে পারছে না। তবু প্রাণের মায়ায় বরফের কাদা ভেঙে চলতে হচ্ছে। কতক্ষণ চলতে হবে কে জানে?

ঘণ্টাখানেক পরে অমূল্য এবং শেরপারা এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিল। আর তার একটু পরেই একফালি জায়গা পাওয়া গেল। মেস-টেন্ট্ অর্থাৎ বড় তাঁবুটা সহ গুটি পাঁচেক তাঁবু টাঙানো যেতে পারে। তবে তার আগে জায়গাটার নরম ও অসমতল তুষারকে যথাসম্ভব শক্ত ও সমতল করে নিতে হবে।

তাই করা শুরু হল। মাউন্টেনীয়ারিং বুট পরিহিত সদস্যরা এবং শেরপারা সেখানে নাচতে শুরু করে দিল আমরা পাশে

দাঁড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে সেই নাচ দেখতে থাকলাম।

ওদের পায়ের চাপে নরম তুষার খানিকটা বসে গিয়ে কিছু শক্ত ও সমতল হল। তবে এখনও 'আইস-অ্যাক্স' পুঁতলে সবটাই বরফে ঢুকে যাচ্ছে। তারই ওপরে তাঁবু টাঙানো গেল।

প্রাণেশ ও নির্মল একটা টু-মেন টেন্ট্ টাঙিয়ে আমাকে বলে—তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকে পড়ুন।

বাইরে বরফ পড়ছে। ভেতরে আসি। দুজনের তাঁবুতে তিনজন থাকব। এখন মাথা বাঁচানো বড় কথা। তিনজন কেন, প্রয়োজন হলে ছ'জন থাকতে হবে।

তা নয় না হয় থাকা গেল। কিন্তু জুতো মোজা টুপি প্যান্ট্, উইণ্ডপ্রুফ জ্যাকেট পুল-ওভার সার্ট—সবই যে ভিজে গিয়েছে। বাড়তি পোষাক কিছুই নেই সঙ্গে। সবচেয়ে বড় বিপদের কথা—এয়ার ম্যাট্রেস ফুলছে না এবং স্লীপিং ব্যাগ ভিজে গিয়েছে।

প্রাণেশ আমাকে বলে—ভেজা জামা প্যান্ট খুলে স্লীপিং-ব্যাগে ঢুকে পড়ুন।

কিন্তু স্লীপিং-ব্যাগও যে ভিজে!

—তা হোক্ গে। আপনি গায়ে কোনো ভিজে জিনিস রাখবেন না।

প্রাণেশ অভিজ্ঞ পর্বতারোহী। আমি তার পরামর্শ মেনে নিই। শুধু ড্রয়ার ও ভেস্ট গায়ে রেখে বাকি সব খুলে ফেলি। তারপরে স্লীপিং ব্যাগে ঢুকে যাই।

শীত কমে না। কমবে কেমন করে? এয়ার-ম্যাট্রেস ফোলে নি, স্লীপিং-ব্যাগ ভিজে। টুপি দস্তানা মোজা—কিছুই নেই। বাইরে বরফ পড়ছে, বরফের ওপরে শুয়ে আছি। উত্তাপ প্রায় শূন্যের হাজার ফুট। ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছি, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

দোরজি ও রূপা চা নিয়ে আসে। এই মুহূর্তে ওরা আর শেরপা ও গাইড নয়, স্বয়ং দেবদূত। আমি যখন শুধু নিজেকে নিয়ে অস্থির, ওরা তখন সবার জন্য বরফ গলিয়ে চায়ের জল গরম করে ফেলেছে। কৃতজ্ঞতায় আমার চোখ দুটি জলে ভরে ওঠে। হিমালয়পথের এই সর্বশ্রেষ্ঠ সখাদের দান আমি সানন্দে গ্রহণ করি। গরম চায়ের মগ ঠোঁটে ঠেকিয়ে আমি মৃত্যুর নরক থেকে জীবনের স্বর্গে ফিরে আসি।

চা-বিস্কুট খেয়ে খানিকটা সুস্থ হয়ে উঠি। তবু চোখ বুজতে পারি না। সারাদিন অমানুষিক পরিশ্রম করেছি। সকালেও শুধু চা-বিস্কুট খেয়ে বওনা হয়েছি। খুবই খিদে পেয়েছে। দোরজি বলে গেল, পাসাং নাকি খিচুড়ি রাঁধার চেষ্টা করছে।

দুজনের তাঁবুতে তিনজন শুয়েছি। দরজার পর্দাটা ছেঁড়া, ভেতরে তুষারের ছাঁট আসছে। ছোট তাঁবু। মাঝে মাঝেই বরফের ভারে নুয়ে পড়ছে। তাড়াতাড়ি টোকা মেরে বরফ ঝেড়ে ফেলতে হচ্ছে। নইলে তুষার সমাধি হয়ে যাবে।

তবু তো আমরা পা টান করে শুতে পেরেছি। দশজনের মেস-টেন্টে ওরা ষোলজন ঢুকেছে, তার ওপরে মালপত্র। ওদের বোধকরি সারারাত বসে কাটাতে হবে।

অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান হয়। সেই বহু প্রতীক্ষিত খিচুড়ি আসে। তিন ঘণ্টা পরিশ্রমের পরে পাসাং আধ-প্যান জল আর দুই প্রেসার-কুকার খিচুড়ি রান্না করতে পেরেছে। তার থেকে আধমগ জল ও দু-চামচ খিচুড়ি পাওয়া গেল। এর চেয়ে বড় পাওয়া জীবনে আর কিছু পেয়েছি বলে মনে করতে পারছি না।

গরম খিচুড়ি পেটে পড়ায় শরীরটা একটু গরম হল। এবারে ঘুমিয়ে পড়তে পারলেই সকল দুঃখ-কষ্ট ও চিন্তা-ভাবনার কবল থেকে সাময়িক রেহাই পাবো। কিন্তু ঘুম আসবে কি?

কেন আসবে না? সারাদিন এত পরিশ্রম করেছি আর রাতে ঘুম আসবে না। আমাকে যে ঘুমোতেই হবে।

কিন্তু সে ঘুম যদি আর না ভাঙে? আজ রাতের ঘুম যদি আমার জীবনের শেষ ঘুম হয়?

হতেও বা পারে। কারণ আজ তাঁবু ফেলার সময় বহু চেষ্টা করেও বুঝতে পারি নি—কোথায় তাঁবু টাঙাচ্ছি। এ জায়গাটা কি উপত্যকা না হিমবাহ, গিরিশিরা অথবা গ্রাবরেখা, 'আইস-ফল' কিংবা 'এ-ভ্যালান্‌শ পয়েন্ট'—কিছুই জানি না। রাতের অন্ধকারে যদি সারা শিবিরটা ধ্বসে পড়ে? আর আমরা গড়িয়ে পড়ি হাজার হাজার ফুট নিচে।

তারপরে বহু বছর বাদে, কেউ কি কোনদিন খুঁজে পাবে আমাদের বিকৃত দেহগুলোকে? নূতন কোনো 'রহস্যময় রূপকুণ্ড' কি লেখা হবে আমাদের নিয়ে? নৃবিজ্ঞানীরা কি কোনদিন আবিষ্কার করতে পারবেন—আজকের এই মৃত্যুশীতল রাতে আমরা গুটিকয়েক জীবনের পূজারী কেমন করে হিমালয়ের কোলে শেষবারের মতো ঘুমিয়ে পড়েছি?'

না। সে-রাতের সেই ঘুম, আমার জীবনের অনন্তনিদ্রায় পরিণত হয় নি। পরদিন সকালে যথাসময়ে ঘুম ভেঙেছে। আমরা আবার ধুমধার-কান্দি গিরিবর্ত্মের দিকে এগিয়ে গিয়েছি।

কিন্তু সে-সব অন্যকথা। আমি ভাবছি বাহাত্তর সালের ৬ই অক্টোবরের সেই রাতটির কথা। ভ্রমণপথে সেটি আমার জীবনের সবচেয়ে দুঃখের রাত। সে রাতের মতো আমি আর কখনও মৃত্যুর অত কাছে পৌঁছই নি। অথচ তারপর থেকে এই ষোলো বছর ধরে এটি আমার সবচেয়ে সুখের স্মৃতি আর জীবনের একটি পরমপ্রিয় সম্পদ।

এবারে আবার অন্য প্রসঙ্গে আসছি। আচ্ছা, সংসারে সবচেয়ে বড় কাম্য কি? অর্থ, বিদ্যা, খ্যাতি কিম্বা ভালোবাসা?

আমি উত্তর দেব—ভালোবাসা। ভালোবাসার ভিখারী আমি। আর আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন, কোথায় আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা পেয়েছি? দ্বিধাহীন চিত্তে জবাব দেব—আসামে, আমার অমরাবতী আসামে।

অথচ আমি আসামের ওপরে মাত্র একখানি বই লিখেছি। সেই একখানি বই লিখে আসামের মানুষদের তথা অসমীয়া ও আসামবাসী বাঙালীদের কাছ থেকে আমি যে ভালোবাসা পেয়েছি, তা বোধকরি যে কোন লেখকের পক্ষে পরম প্রত্যাশা। তারই একটি ঘটনা আজ নিবেদন করছি।

ঘটনাটি ১৯৭৯ সালের মে মাসের। অর্থাৎ বিদেশী বিতাড়ন আন্দোলন হবার মাত্র মাস কয়েক আগের কথা। আমার পুত্র গৌতম তখন বেলুড়মঠ বিদ্যামন্দিরে পড়ে। ওর কলেজ ছুটি হল, সে হস্টেল থেকে বাড়ি এলো। বেশ কয়েকমাস কলকাতায় স্থির জীবন যাপন করছিলাম। ভাবলাম—ওকে নিয়ে একবার গারো পাহাড়টা ঘুরে আসা যাক। বহু বছর আগে গিয়েছি। শুনেছি সেখানে নাকি অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

কলকাতা থেকে গারো পাহাড়ের প্রধান শহর তুরা যাবার পথ আসামের গোয়ালপাড়া হয়ে। তাই চিঠি লিখলাম আসাম সরকারের জনৈক সচিব বন্ধুবর দিলীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায়কে। তিনি জানালেন, গারো পাহাড় ভ্রমণের জন্য আমাকে শুধু ট্রেনে চড়ে কলকাতা থেকে নিউ-বঙ্গাইগাঁও স্টেশনে পৌঁছতে হবে। তারপরে যা করবার সবই করবেন গোয়ালপাড়ার এস. ডি ও, তরুণ আই. এ. এস. রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। আমি যেন তাঁকে যাবার ট্রেন ও দিনটি জানিয়ে দিই। চিঠি দিলাম রঞ্জনবাবুকে। কয়েক-

দিন বাদে সেই অপরিচিত মহকুমা শাসক আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে উত্তর দিলেন। লিখলেন নির্দিষ্ট সময়ে প্লাটফর্মে চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবেন। অতএব নির্দিষ্ট দিনে গৌতমকে নিয়ে কামরূপ এক্সপ্রেসে সওয়ার হওয়া গেল।

'লেট' করা কামরূপ-এক্সপ্রেসের একটা আবশ্যিক নিয়ম। সুতরাং সেদিনও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হ'ল না। খুবই খারাপ লাগছিল। রঞ্জনবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। ভদ্রলোক মহকুমা শাসক, ব্যস্ত মানুষ। তাঁর পক্ষে গোয়ালপাড়া থেকে নিউ-বঙাইগাঁও এসে এতক্ষণ স্টেশনে অপেক্ষা করা খুবই অসুবিধে। কিন্তু আমিও যে অসহায়। যাত্রীর জন্য রেলগাড়ি, কিন্তু সে গাড়ি কখনও যাত্রীর ইচ্ছেয় চলে না।

নির্দিষ্ট সময়ের আড়াই ঘণ্টা পরে হাওড়া কামরূপ এক্সপ্রেস নিউ-বঙাইগাঁও স্টেশনে যাত্রার যতি টানল। এখানেই ব্রডগেজ লাইন শেষ হযে গেল। যাঁরা এর পরে যাবেন, তাঁরা এখান থেকে মিটারগেজ গাড়িতে উঠবেন। সুতরাং গাড়ি থামতেই চিৎকার চেঁচামেচি ও হৈ-হট্টোগোল শুরু হয়ে গেল। আমরা সবার শেষে গাড়ি থেকে নামলাম।

প্লাটফর্ম লোকে লোকারণ্য। কোনদিকে যাবো, কোথায় সেই চায়ের দোকান?

গৌতম বলে "—ওভার-ব্রিজের দিকে চলো, সাধারণত সিঁড়ির কাছেই টি-স্টল হয়।

তাই চলি। এবং একটু বাদে বুঝতে পারি, ওর অনুমান মিথ্যে নয়। তাড়াতাড়ি পা চালাই। রঞ্জনবাবু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন।

সহসা গৌতম বলে ওঠে—আমাদের সঙ্গে এই ট্রেনে নিশ্চয়ই কোনো নেতা কিম্বা মন্ত্রী এলেন।

—কেমন করে বুঝতে পারলি ?

—ঐ দেখছ না স্কুলের ছেলে-মেয়েরা য়ুনিফর্ম প'রে মালা হাতে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে।

সে ঠিকই দেখেছে। শুধু ছেলে-মেয়েরা নয়, বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিও রয়েছেন ওখানে, অন্তত তাঁদের পোশাক দেখে তো তাই মনে হচ্ছে।

বিপদে পড়া গেল! মন্ত্রী এলে তো রঞ্জনবাবুর তাঁকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হবে। তিনি যে এখানকার এস. ডি. ও। তিনি তো আমার দিকে নজর দিতে পারবেন না! দুশ্চিন্তা নিয়ে এগিয়ে চলি।

চা-যের দোকানের একপাশে একজন যুবক দাঁড়িয়ে আছেন। মাঝারী গড়ন, ফর্সা ও সুশ্রী। ভারী স্মার্ট চেহারা। পরনে প্যান্ট্ এবং বুশসার্ট। এটাই আই. এ এস, অফিসারদের প্রিয় পোশাক।

ইনি রঞ্জনবাবু হতে পারেন। কিন্তু কোনো মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় পদার্পণ করলে তো তাঁর কোট-প্যান্ট টাই পরা উচিত ছিল। তাব ওপরে মন্ত্রীমহাশয় এসেছেন আর তিনি এভাবে চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে!

তবু তাঁর দিকেই এগিয়ে চলি। ভদ্রলোকও আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি এগিয়ে আসছেন। তাহলে কি আমার অনুমান মিথ্যে নয় ?

সামনে এসে ভদ্রলোক নমস্কার করেন, আমি প্রতিনমস্কার করি। তারপরে কিছু বুঝে উঠতে পারার আগেই জনৈক সঙ্গী আমার কিট্‌ব্যাগ ও গৌতমের স্যুটকেশ প্রায় ছিনিয়ে নেয়। রঞ্জনবাবু বলেন—খুব কষ্ট পেয়েছেন তো! গাড়ি আড়াই-ঘণ্টা লেট।

কিন্তু এই কথাটি যে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করব ভেবেছিলাম। না, সে সুযোগ আর পাওয়া গেল না। বরং উত্তর দিতে হয়—না, না। কষ্ট হবার মতো কিছু নয়।

ছাত্র ছাত্রীদের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা ভিড় থেকে কয়েকজন ভদ্রলোক এসে আমাদের ঘিরে ধরেন। রঞ্জনবাবু পরিচয় করিয়ে দেন কলেজের অধ্যাপক, স্কুলের হেডমাস্টার, মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার, ব্যবসায়ী, প্রাক্তন এম. এল. এ., জিলা সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক ইত্যাদি।

পরিচয়ের পরে হেডমাস্টার উদয়বাবু ছাত্র-ছাত্রীদের দেখিয়ে বলেন—একবার ওদিকে যেতে হবে।

কেন? মনে মনে ভাবি। আমাকে কি আবার মন্ত্রীমহাশয়ের সঙ্গে আলাপ করতে হবে নাকি?

আমার দ্বিধা দেখে রঞ্জনবাবু কাছে আসেন। তিনিও একই অনুরোধ করেন। এবারে তাঁকে জিজ্ঞেস করি কথাটা। তিনি হাসতে হাসতে বলেন,—না, না, তেমন কেউ আসেন নি আজ। সেদিন কথায় কথায় উদয়বাবুকে বলেছিলাম আপনার কথা। ওঁরই স্কুলের ছাত্র ছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী ও শহরের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আপনাকে 'রিসিভ' করতে এসেছেন।

হায় হরি! আমারই জন্য এই আয়োজন! কিন্তু এতে আমি বিস্মিত হচ্ছি কেন? আমি যে আসামে এসেছি। আসাম আমায় ভালোবাসে।

আমি এর অযোগ্য। তবু আসামের ভালোবাসার দান আমি মাথায় তুলে নিই। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসি সেই সারিবদ্ধ ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে। ওঁরা শাঁখ বাজায়, পুষ্পবৃষ্টি করে, গলায় মালা দেয়। মালায়-মালায় ঢেকে যায় আমার চোখ। হে ঈশ্বর, তুমি পরম করুণাময়! তুমি আমাকে এমন অনাবিল ভালোবাসার

অধিকারী করলে! তোমাকে প্রণাম!

ফুল আর মালার পালা সাঙ্গ হবার পরে সবার সঙ্গে বেরিয়ে আসি বাইরে। একখানি করে ট্রাক, জীপ ও এ্যাম্বাসাডার দাঁড়িয়ে রয়েছে। ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা ট্রাকে উঠতে শুরু করেন।

রঞ্জনবাবু বলেন—আমি গৌতমকে নিয়ে জীপে যাচ্ছি, আপনি উদয়বাবুর সঙ্গে আমার গাড়িতে আসুন। তিনি এ্যাম্বাসাডারের দরজা খুলে ধরেন।

উদয়বাবু ও সাহিত্য পরিষদের অম্বিকাবাবু আমার পাশে এসে বসেন। আর সামনে ওঠে দুটি অসমীয়া মেয়ে। অম্বিকাবাবু একজন অসমীয়া সুলেখক ও স্থানীয় আরেকটি স্কুলের প্রধান-শিক্ষক। মেয়ে দুটির পরিচয় এখনও জানিনে।

গাড়ি চলতে শুরু করে। হঠাৎ একটি মেয়ে আমার দিকে ফিরে বলে ওঠে—শঙ্কুদা, আমি নীলিমা।

নীলিমা! আমি তার দিকে তাকাই। শ্যামবর্ণা যুবতী। দোহারা চেহারা। কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।

একটু হেসে সে আবার বলে আমি আপনাকে চিঠি লিখে-ছিলাম, আপনি উত্তর দিয়েছিলেন।

মনে পড়ে আমার। মেয়েটির নাম নীলিমা দাস। এখানেই থাকে, বি. টি. পড়ে। আমার বই পড়ে একখানি ভারী সুন্দর চিঠি লিখেছিল। কিন্তু সে আমার আসার খবর পেলো কেমন করে?

সেই কথাই জিজ্ঞেস করি ওকে।

—আমাদের এখানে কেউ এলে, আমরা ঠিক জানতে পারি। উত্তর দেয় নীলিমার পাশে বসে থাকা মেয়েটি। তার রং ফর্সা, দেখতে সুশ্রী, বয়স নীলিমার চেয়ে কিছু কম বলেই মনে হচ্ছে।

আমি তাকে বলি—কিন্তু তোমাকে তো চিনতে পারলাম না!

—আমার ছোট বোন নীহারিকা গোয়ালপাড়া এস. ডি. ও অফিসে কাজ করে। নীলিমা উত্তর দেয়।

আমি তাকে আবার বলি—তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় খুব ভাল লাগছে।

—আর আমি যে অফিস কামাই করে এখানে এসেছি, তা বুঝি কিছু নয়? নীহারিকার কণ্ঠস্বরে অভিমান।

অসুবিধেয় পড়ি। তাড়াতাড়ি বলি—না, না, তুমি আসাতেও খুশি হয়েছি বৈকি! তা তুমি কবে গোয়ালপাড়া ফিরবে?

—কাল সকালে, আপনার সঙ্গে।

—কিন্তু আমি তো রঞ্জনবাবুর সঙ্গে আজই গোয়ালপাড়া চলে যাবো!

—তা কেমন করে? অম্বিকাবাবু বলে ওঠেন—আজ যে গোয়ালপাড়া জিলা সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে এখানে আপনার একটি সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।

অম্বিকাবাবু শেষ করতেই উদয়বাবু আমার একখানি হাত চেপে ধরেন। বলেন-বঙাইগাঁও শহরবাসীদের এ অনুরোধ আপনাকে রাখতেই হবে। সামান্য আয়োজন আমাদের, তবু আপনি দয়া করে আপত্তি করবেন না।

না, আমি আপত্তি করি নি। সেদিনটি আমি বঙাইগাঁও শহরেই থেকে গিয়েছি। এবং রেলওয়ে স্কুলে অনুষ্ঠিত সভায় যোগ দিয়ে ধন্য হয়েছি। সেদিন সন্ধ্যায় বঙাইগাঁও শহরের অসমীয়া এবং বাঙালীরা মিলিত হয়ে আমার মতো একজন নগণ্য লেখককে যে সম্মান দান করেছিলেন, তা যে কোন সুসাহিত্যিকের পক্ষে পরম-গৌরব বলে বিবেচিত হতে পারে। তাঁরা সেদিন আমাকে স্টেইনলেস স্টিলের বেশ বড় একটি 'শরাই' বা পবিত্র-

আধার এবং একখানি মানপত্র দান করেছেন। বলা-বাহুল্য মানপত্রটি বাংলায় নয়, অসমীয়া ভাষায়। সেই মানপত্রখানি থেকে কয়েকটি ছত্র আমি পাঠক-পাঠিকাদের উপহার দিচ্ছি—

· আমাৰ ( আমাদের ) মাজত ( মাঝে ) আপোনাৰ ( র ) উপস্থিতিয়ে আজি অসমীয়া-বঙালী সাহিত্যসেবী আৰু (এবং) সাহিত্য-প্ৰেমী ৰাইজক (জনসাধারণ) পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ মিলা-প্ৰীতি আৰু সম্প্ৰীতিৰ ভেটি (ভিৎ) সুদৃঢ় কৰিছে ; উপৰিও যি (যে) কোনো বিভেদকামী শক্তিৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম কৰিবৰ কাৰণে শক্তি যোগাইছে আৰ প্ৰেৰণা দিছে।

' আমাৰ ভিতৰত যাতে সম্প্ৰীতিৰ সেতু সুদৃঢ় হয আৰ উত্তৰোত্তৰ বৃদ্ধি পায় তাকে (তাই) আপোনাৰ অমৰ লিখনিৰ পৰা ( থেকে ) আশা কৰিলো। · সাহিত্যৰ জৰীযতে ( আপনার সাহিত্যের মাধ্যমে ) সৰ্বশ্ৰেণীৰ মানুহৰ ( মানুষের ) ভিতৰত আধ্যাত্মিক মিলনৰ সেতু ৰচনাৰ ক্ষমতা দিয়ে (দিক) তাৰ বাবে (জন্য) প্ৰাৰ্থনা জনালো ( জানালাম )·· ,

আপোনাৰ গুণমুগ্ধ

গোৱালপাৰা জিলা সাহিত্য পৰিষদৰ পক্ষে···,

আমার মধ্যে তাঁদের সে আশা পূর্ণ হবে কিনা জানা নেই আমার। পরম-মঙ্গলময়ের কাছে তাঁরা আমার জন্য যে প্রার্থনা জানিয়েছেন, আমি তারও যোগ্য নই। তবু আমি মানপত্রের এই অংশটুকু আপনাদের পাঠ করার জন্য অনুরোধ করলাম কারণ এর থেকে আপনারা বুঝতে পারছেন—বাঙালী লেখকদের প্রতি অসমীয়া পাঠক-পাঠিকাদের ভালোবাসা কত নিবিড়, আর বাংলা-ভাষার সঙ্গে অসমীয়া ভাষার পার্থক্য কত তুচ্ছ!

অথচ এই তুচ্ছ পার্থক্য নিয়েই কি দীর্ঘস্থায়ী বিরোধ দেখা

দিয়েছে। মুষ্টিমেয় কিছু স্বার্থপর মানুষ মিথ্যে বিভেদের বীজ বুনে লাভের ফসল তুলছে। তারা ভারত-আত্মার শান্তি নষ্ট করছে, ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ওপর আঘাত হানছে, আমাদের জাতীয়-সংহতিকে বিপন্ন করে তুলেছে।

আমি কিন্তু এতে একেবারেই নিরাশ হয়ে পড়ি নি। আমি জানি মুষ্টিমেয় স্বার্থপরদের এই অপচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। ভারতের অমর-আত্মা এবং শাশ্বত-সংস্কৃতির শুভপ্রভাবে অদূর ভবিষ্যতে এই আঞ্চলিকতা ও অবিশ্বাসের অবসান ঘটবে, প্রেমের অমৃতধারায় নিভে যাবে হিংসার আগুন। কারণ আমি বাংলার গঙ্গাসাগর আর গুজরাতের বেট-দ্বারকায় একই স্নানার্থীকে দেখেছি, গোয়ার গীর্জা ব্যাসিলিকা ও কাশ্মীরের হজরতবাল মসজিদে একই পুর্ণ্যার্থীকে দেখেছি। আসামের কামাখ্যা মন্দিরে, বিহারের পরেশনাথ শিখরে, অমৃতসর স্বর্ণমন্দিরতলে আর লাদাখের হেমিস-গুম্ফার প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে আমার বার বার ঐক্যবদ্ধ ভারতের কথাই মনে পড়েছে: আমার মনে হয়েছে, আমরা হিন্দু নই, মুসলমান নই শিখ নই, আমরা বাঙালী নই খাসিয়া নই অসমীয়া নই, 'আমি আটায়ে ভারতীয়'—আমরা সবাই ভারতীয়।

এবং এটাই তিরিশ বছরের পথিক-জীবনে আমার সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা।